পহ্‌র জাঙাল
তন্‌চংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা
প্রকাশনায়
পহ্‌র জাঙাল প্রকাশনা পর্ষদ

উৎসর্গ

সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তনচংগ্যাদের শিক্ষা,
সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে যারা
আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছেন সে সকল গুণীজনকে।

'পহ্‌র জাঙাল'
তনচংগ্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা

'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ

পহ্‌র জাঙাল

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

(বিষু সংখ্যা)

১লা বৈশাখ, ১৪১০

১৪ই এপ্রিল, ২০০৩

প্রকাশনায়

'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ

কম্পোজ ও মুদ্রণে

গাজী কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৩৮৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৪৯৭

শুভেচ্ছা মূল্য

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা।

যোগাযোগ ঃ বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, ব্লক-বি/এ, রুম নং- ৭, ২ নং গেইট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

Scanned with CamScanner

শুভেচ্ছা বাণী

প্রকৃতির অপরূপ সাজে সজ্জিত সবুজ বন-বনানী ঘেরা পাহাড়, ঝর্ণা, নদী আর হ্রদের মিলন মেলা এই পার্বত্য অঞ্চল। বাংলাদেশের এক দশমাংশ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এই পার্বত্য অঞ্চল। এখানে রয়েছে বিভিন্ন জাতি সত্ত্বা। এই বিভিন্ন জাতি সত্ত্বাগুলোর ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পার্বত্য অঞ্চলকে করে তুলেছে আরো সমৃদ্ধ। এই পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত জুম্ম জাতি সত্ত্বার মধ্যে তনচংগ্যা একটি। সংস্কৃতির একটি অংশ "বিঝু" অন্যান্য সকল জাতির মত তনচংগ্যারাও এই উৎসবকে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে থাকে তাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগত সূত্র ধরে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তনচংগ্যা ছাত্র/ছাত্রীরা বিঝু উপলক্ষে "পহ্‌র জাঙাল" নামে একটি সংকলন প্রকাশ করছে জেনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুস্থ মনন বিকাশে সহায়ক। তাদের এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

পরিশেষে যারা এই "পহ্‌র জাঙাল" নামক সংকলনটি প্রকাশ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতিভার সুস্থ বিকাশ ঘটুক এবং তাদের ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তর সফলতা ও মঙ্গল কামনা করছি।
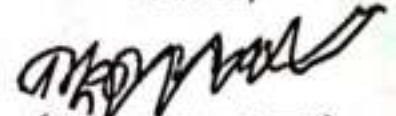
প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
সভাপতি
বাংলাদেশ তনচংগ্যা কল্যাণ সংস্থা।

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানায় পার্বত্য অরণ্য জনপদে আবহমান কাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা সমূহের আবাস। এ জাতিসত্ত্বা সমূহের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা "তঞ্চঙ্গ্যা জনজাতি" । ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও শ্বাপদ সংকুল বর্তমান এ বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আর্থিক দৈন্যদশার সাথে ও আধুনিক চলমান বিশ্বায়নের যুগে এ জনজাতি নিজেদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার বাসনা এ যুগের সুধীজন ও যুব সমাজ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করতে পেরেছে বলেই আজ তাদের যৌবনদীপ্ত মন চেতনা ও চিন্তাধারা বঞ্চিত, অবহেলিত ও পংগু সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার উদগ্র চেতনাশক্তি নিয়ে ম্রিয়মান সমাজকে সঠিকপথে চালিত ও উজ্জীবিত করার মহান প্রয়াস হিসেবে এগিয়ে আসুক-"আজ তাই চায়" । বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার (বাতকস্) সাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে ছিটেফোটা এ বিভাগের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়; যা শুধুমাত্র সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ। সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক কোন কার্যক্রম এ বিভাগ বা বাতকস্ দৈন্যতার কারণে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনি। আমি অতীব আনন্দ ও গৌরবের সাথে স্বীকার করছি যে, নিতান্ত সীমাবদ্ধতার মাঝে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা জাতির আগামী প্রজন্মের ধারক-বাহক উদীয়মান তরুণ ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে তাদের কচিহাতের লেখনীর প্রথম প্রয়াস-'পহ্‌র জাঙাল' (আলোকিত পথ) নামে ১৪০৯ বাংলা বর্ষ বিদায় ও ১৪১০ বাংলা নববর্ষ বরণ উপলক্ষে 'বিষু সংকলন' বাতকস্ সাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিভাগের পহ্‌র জাঙাল প্রকাশনা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সুন্দর জীবন ও সুসমাজ গঠনে সুধী নবীন উদীয়মান ছাত্র সমাজের এ মহতী প্রয়াস, উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই ও সুন্দর মঙ্গলময় সাফল্য কামনা করি। আগামী দিনগুলিতে তাঁদের বৃহত্তর কার্যক্রম অটুট থাকুক-এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সদাশয় সরকার, সুধীসমাজ এবং তঞ্চঙ্গ্যা জনজাতির বিদগ্ধজনকে সামাজিক অবক্ষয় রোধকল্পে সঠিক সুন্দর জীবন ও সমাজ গঠনে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিক আহবান জানাই।

ধন্যবাদান্তে,

(নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা)
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
দক্ষিণ কালিন্দীপুর
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
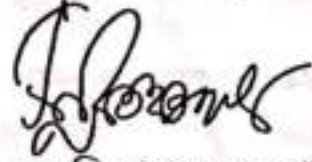
শুভেচ্ছা বাণী

বিষু উপলক্ষে তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী 'পহ্‌র জাঙাল' নামে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। ছাত্র সমাজের এই সচেতন উদ্যোগের ফলে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এবং জাতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তাদের এই সাহসী ভূমিকার কথা সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতি স্মরণ রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের পক্ষ থেকে এটা তৃতীয় যৌথ প্রয়াস। আমি আশা করি প্রতি বিষুতে পহ্‌র জাঙাল আগামী বছরের পথকে আলোকিত করবে এবং উত্তরোত্তর পহ্‌র জাঙালের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র সমাজের এই সাহসী উদ্যোগের শুভফল এবং সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে 'বিষু' আনন্দ বয়ে আনুক এই কামনা করি।

(সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা)
মহা-সচিব
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর বুকে হাজারো কোটি প্রাণীর মধ্যে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতির অধিকারী। বৈচিত্রময় পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সত্ত্বার রয়েছে ভিন্ন সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন একারণে যে একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না বা কঠিন ও বায়বীয় পদার্থের মত পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া যায় না। আসলে সংস্কৃতি একটি বিমূর্ত বিষয়, উপলব্ধি, অনুভব, হৃদয় এবং বুদ্ধি দিয়ে বুঝার বিষয়। মানুষের নিত্য কর্মকান্ডের মধ্যে তার সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুটিত হয়। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মত বাংলাদেশের এক দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারটি জাতিসত্ত্বার রয়েছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি তার মধ্যে- তন্‌চংগ্যাদেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কালের বিবর্তনে শত বছর আগে বিভিন্ন জাতি সত্ত্বার ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তন্‌চংগ্যা নামে ক্ষুদ্র একটি জাতি সত্ত্বার উদ্ভব ঘটলেও তাদের বিকাশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তন্‌চংগ্যারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে এ যাবৎ লালন করে আসলেও সময়ের অগ্রগতির সাথে তাদের সংস্কৃতি খুব একটা তেমন অগ্রগতি লাভ করেনি। তাই তন্‌চংগ্যাদের সংস্কৃতিকে ঠিকিয়ে রাখা ও উন্নতির পথে ধাবিত করার লক্ষ্যে 'পহ্‌র জাঙাল' (আলোকিত পথ) তন্‌চংগ্যাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা পর্ষদ এর পক্ষ হতে প্রকাশিত 'পহ্‌র জাঙাল' ১ম সংখ্যাটি আজ সচেতন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনা সকল পাঠক মহলের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমি স্বস্তি বোধ করছি।

শ্রদ্ধাজন, যারা তাদের সু-চিন্তিত মতামত-আর্থিক সহযোগিতা ও নিজের মূল্যবান সময় এবং লেখা দিয়ে প্রকাশনাটিকে প্রাণ দান করেছেন, তাদের সকলকে 'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস চিন্তাশীল মহলের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে জানি না। যদি পাঠকের প্রগতিশীল চেতনাকে সামান্য স্পর্শ ও করে, তবেই আমাদের পরিশ্রমের স্বার্থকতা, আর অনেক প্রচেষ্টার পর ও ভুল ত্রুটি হতে পারে তাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

– পরিশেষে যারা আমাদের 'লেখা আহ্‌বান' বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে প্রকাশনাটি প্রকাশ করার দৃঢ় মনোবল জুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল বিষু'র অকৃত্রিম [প্রাকৃতির] শুভেচ্ছা এবং যাদের গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি তাদের নিকট 'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ

সূচীপত্র

'পহ্‌র জাঙাল' প্রকাশনা পর্ষদ

‘পহ্‌র জাঙাল’

তনচংগ্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা

তঞ্চঙ্গ্যা ও তাদের ভাষা-রূপ প্রসঙ্গ

অধ্যাপক ডঃ মনিরুজ্জামান
[বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

১। ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে পার্বত্য আধিবাসীদিগের মধ্যে চাকমাদের পরিচিতি সমধিক; এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি। সাধারণ পরিচিতিতে 'তঞ্চঙ্গ্যা'গণ চাকমাদেরই অংশ বিশেষ। এদের অন্য পরিচয় 'সাপ্রেকুল্যা'। দৈংনাকদের সাথেও এদের অর্থাৎ তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কের কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেন। অনেকের মতে 'দৈংনাক' প্রাচীন মারমাদের দেওয়া নাম। আরাকান সামন্তরাজ মেঙ্গাদির প্রজা-কুলকেই মারমারা 'দৈংনাক' নামে অভিহিত করতো। সুতরাং চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা -সাপ্রেকুল্যা এবং দৈংনাকদের মূল উৎস (root) সম্ভবত এক। পাহাড়ে চাষাবাদ এদের মধ্যে ঐক্যের কারণ। তৈনছড়ি (বার তালুক)-তে তৈন (নদী)-তং (টং বা পাহাড়)-য়্যা (চাষের কাজ) এই তিন শব্দের সমন্বয়ে এই নামের উৎপত্তি ঘটা সম্ভব। 'তৈন-তং-য়্যা' থেকেই আধুনিক 'তঞ্চঙ্গ্যা'র ব্যবহার।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ চাকমাদের থেকে দৃশ্যে এবং সামাজিক আচারে ভিন্ন, অর্থাৎ এদের পোষাক-আশাক এবং বৈবাহিক আচারাদি চাকমাদের অপেক্ষা খানিকটা স্বতন্ত্র। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে চাকমাদের স্থান অবশ্যই উচ্চে। তঞ্চঙ্গ্যাগণ সেই অবস্থান ও সুযোগাদি থেকে দূরে অবস্থিত। দেহাকৃতিতে উভয়েই মঙ্গোলীয়। ভাষাগতভাবে এদের পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। সাক-প্রে অঞ্চলবাসীদের সাথেও এদের মিল যথেষ্ট। চাকমা রাজ বিজয়গিরির আমলে সাপ্রেকুল অঞ্চলে যুদ্ধবিজয়ান্তে স্থানীয় স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে যে জাতিগত মিশ্রণ ঘটে, তঞ্চঙ্গ্যাগণ তাদেরই উত্তরপুরুষ। এরাও গজাভুক্ত ও গজা-বিভক্ত জাতি বটে, তবে এদের মধ্যে বিশেষভাবে মংলাগছা, মেলংগছা, লাংগছা এইসব প্রধান গজার সদস্যগণ এখনও "সাপ্রেগীতের" মাধ্যমে সেই ইতিহাস স্মরণ করে থাকেন। সাপ্রে-রাজাগণ তঞ্চঙ্গ্যা ছিলেন। সর্বশেষ রাজা ইয়ংজ (আরাকানী মতে) বা অরুণ যুগের কালে বা তার পর পরই আরাকান সামন্তরাজ মেঙ্গাদির হাতে এদের একটি অংশ বন্দী হয় ও পরে দৈংনাক নামে পরিচিত হয়। দৈংনাক একটি মারমা শব্দ, এর প্রথম অর্থ 'যোদ্ধা', কালে তা 'বন্দী প্রজা' অর্থ গ্রহণ করে।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ চাকমাদের অপেক্ষা ভাষাগতভাবে বিশেষ ততখানি পৃথক নয়, যদিও ঔপভাষিক বিবর্তন এদের মধ্যে লক্ষ্য করা সম্ভব। কিন্তু দৈংনাকগণের ভাষার গঠন আজ অনেকখানিই পৃথক হয়ে গেছে। আরাকানীদের সাথে এই তিন গোষ্ঠির কারুরই কখনও সুসম্পর্ক ছিল না। আরাকানীদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং তারা এদের সঙ্গে অনেক সময় নিষ্ঠুর আচরণও করতো। এরই ফলে তারা আলীকদম অঞ্চলের ১২ তালুকে ১২ গজায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রমণীজাত সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে আসে। এই গজা-দ্বাদশী তঞ্চঙ্গ্যারা হলেন-(১) মো (২) কার্বুয়া বা কারব্যা (৩) ধন্যা (৪) অঙ্গ্য (৫) লাপোস্যা (৬) রাগ্রী (৭) ওয়া (৮)তাশ্বী (৯) মুলিমা এবং উপযুক্ত মংলা, মেলং ও লাংগছার সমস্ত সদস্য। এরা পৃথক পৃথকভাবে ১২টি তালুকে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করতেন। অধুনা এদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ষড় গজা ও তাদের উপগোষ্ঠিগুলির মধ্যে তা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। অনেকে চাকমা পরিবারের সাথেও মিশে যাচ্ছে। এরাও জুম চাষী।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা চাকমাদেরই প্রায় অনুরূপ। স্বতন্ত্র গোষ্ঠিসত্তা, প্রান্তীয় অবস্থান, সংখ্যা লঘুভিত্তিক মানসিকতা, বাঙ্গালদের প্রতি আকর্ষণ লাভ ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীলতা (ত্রিপুরা-মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকতর বসবাস যার একটি লক্ষণ), আরাকানের কোনও চম্পকনগরের স্মৃতি ও প্রীতি ('যে -যে বাপ ভাই যে-যে-যে/ চম্পকনগরত ফিরি যে') এবং একই সাথে মগদের প্রতি, ভীতি (যথা 'মগে না পেলে বাঘে পায়/ বাঘে না পেলে মগে পায়') জনিত কারণে মানসিকভাবে দেশজ সত্তার দ্বন্দ্ব ও ভ্রমণশীলতা এদেরকে মূলধারা থেকে স্বতন্ত্র করে রেখে থাকবে। এদের গছায় গছায় ধ্বনিউচ্চারণ, রূপতত্ত্ব ও শব্দকোষগত বৈচিত্র্য ও ভেদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা গঠন প্রাচীন বলে দাবী করা হলেও তা অপভ্রংশ যুগে পৌছাবে কিনা সন্দেহ হয়। তবে তা গবেষণা সাপেক্ষ। সাধারণভাবে এদের ভাষায় বহু পরিবর্তন ও মিশ্রণের লক্ষণ সুস্পষ্ট। এছাড়াও তা নানা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। বর্তমান নিবন্ধে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টায় চাকমা ভাষার সাথে একটা সাধারণ তুলনাকেও প্রাসঙ্গিক করা হল।

২। পূর্বসূরীদের ধারণা ও মন্তব্য পর্যালোচনা ঃ

(ক) যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার বৈশিষ্ট্য এভাবে নির্ধারণ করেছেন (১৯৮৫ঃ ৩৭-৩৮)ঃ

চাকমা	দ	>	তঞ্চঙ্গ্যা	র	ঃ	উদাহরণ	কুদ্/কুরু	(ধন্যা গছা);
							কুদি/কুরি	(মো গছা)
চাকমা	জ,ঝ	>	তঞ্চঙ্গ্যা	স/শ	ঃ	উদাহরণ	হাজি/হাশি;	
							অঝা/অসা (ওঝা)।	
চাকমা	র	>	তঞ্চঙ্গ্যা	য়/এ	ঃ	উদাহরণ	মরে/ম-এ, মে।	

নাসিক্য ধ্বনির ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন দেখা যায়, তবে তাতে তালব্যীভবনেরই পরিচয় মেলে, যথা–

বোন/বোঞ

যেম/যেঞ

যোগেশ বাবুর এই ব্যাখ্যা ধ্বনি পরিবর্তনের নয়, ধ্বনি-বৈচিত্র্যের। অর্থাৎ তা ঐতিহাসিক স্তরের নয়, সমকালীন। অর্থাৎ এ দ্বারা তেমন কিছু বোঝায় না। তিনি সংখ্যা শব্দেরও উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৩৯), তাতে বাংলা ধ্ববনির সাথে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, যদিও আঞ্চলিক উচ্চারণ ভিন্নতা বিদ্যমান। এক থেকে দশ পর্যন্ত গণন শব্দগুলি নিম্নরূপ; চাকমার সাথে তার পার্থক্য সামান্য।–

এক্ (১), দি (২), তিন্ (৩), চায় (৪), পাচ্ (৫)

ছোয় (৬), সাত্ (৭), আত্তয্য (৮), নয় (৯), দচ্ (১০)

এইভাবে চোদদা (১৪), ষুল (১৬), আদার (১৮), উনচ (১৯), এগোচ (২১), চুব্বিচ (২৪), পসোচ (২৫), সাদাচ (২৭), ত্রিচ (৩০), এগত্রিচ (৩১), সুত্রিচ (৩৪), সুচল্লিচ (৪৪), সপপান্ন (৫৪), উনষাচ (৫৯), ষাচ (৬০), তেষত্য (৬৩), সষত্য (৬৬), সত্তর (৭০), আদাত্তর (৭৮), সুরাশি (৮৪), উনানব্বই (৮৯), এক শত (১০০) এবং এক কুড়ি/কুদি (১০০০০০০) ইত্যাদি।

এই শব্দ তালিকা দৃষ্টেও দেখা যায় যে কিছু কিছু ধ্বনি নিয়মগতভাবেই ভিন্ন ধ্বনির রূপ নিয়েছে। যেমন, ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলি (কিছু নব্য প্রবণতা ছাড়া) ত-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণ লাভ করেছে এবং চ-বর্গীয় তালব্য ধ্বনি অন্ত্যে বা শব্দশেষে যথাযথ থাকলেও (যেমন–'ষাচ্', 'উনচ্' ইত্যাদি), আদ্য বা মধ্যাবস্থানে শিস-ধ্বনির রূপ লাভ করেছে। শিস ধ্বনি একাধিক বর্ণমালা (শ, ষ, স এবং কখনও ছ) দ্বারা লিখিত হলেও তা মূলতঃ এক (অর্থাৎ ধ্বনি একটিই) এবং তা দন্তমূলীয়। স তার সহধ্বনি। বর্ণমালার অভাবে স দ্বারাই তা বুঝানো যেতে পারে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে লিখিতভাবে কেউ কেউ শ/ষ ব্যবহার করেছেন, যেমন 'সুরাশি' (৮৪), তেষত্য (৬৩) প্রভৃতি। অন্ত্যধ্বনি হলন্ত হলে চ ধ্বনির রূপ নিয়েছে, নচেৎ সাধারণত ঘোষ ধ্বনি রূপেই উচ্চারিত হয়েছে। আন্তস্বরীয় অবস্থানে ঘোষতা দেখা যায়।–

১। অন্ত্য অবস্থানে চ, ছ, শ	→	চ্ (সাধারণ), শ (অগ্রতালব্য ধর্ম),
২। আন্তঃস্বরীয় অবস্থানে অঘোষ	→	ঘোষ,
কিন্তু শ	→	স; (কারব্যা গছায় হ/দ।)
৩। আদ্য অবস্থানে চ, ছ, শ	→	স, চ।

উদাহরণ ঃ

১। উনিদ, উনচ্ (১৯), এগোইৎ, এগোচ্ (২১), সুতিরিত, সুত্রিচ/সুত্রিশ (৩৪)। অন্ত্যে দ/ত্ এর স্বাধীন বিকার বিরল নয়।

২। এগোচ (২১), আদাত্তর (৭৮), এগত্রিচ, এগতিরিত (৩১), পসোচ্, পসিদ (২৫); আহে (আছে)।

৩। সুত্রিচ (৩৪), সুচল্লিশ, সোচল্লিত্ (৪৪), সপপান্ন, সুপপান্ন (৫৪)।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'পসোচ্' (২৫) ধ্বনি বিপর্যয় ঘটিত পরিবর্তন। সেক্ষেত্রেও 'স' ব্যবহারে আন্তস্বরীয় (মধ্যাবস্থান) ক্ষেত্রে শ > স ব্যতিক্রম ঘটে নি।

উল্লেখ্য চাকমাতে শ বিরল কিন্তু এখানে শত, সুরাশি, সুত্রিশ দেখা যায়, অর্থাৎ আদ্য, মধ্য এবং অন্ত্য অবস্থানে শ ধ্বনির ব্যবহার অবিরল। (সন্দেহ হয় এগুলি 'স'-এরই স্বাধীন বিকার।)

স্বরমধ্যবর্তী ধ্বনির ঘোষতা চাকমা, চট্টগ্রামী এবং তঞ্চঙ্গ্যা-তে সাধারণ; পূর্বে উল্লিখিত ২নং উদাহরণসমূহেও এ বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট। এছাড়া

বাক্য ঃ চাল আগে তলা নাই (মো গছা)
চাল আহে তলা নাই। (কারব্যা গছা)
অর্থ ঃ 'ঘরের ছাউনি আছে (আগে), ভিত্ নেই।'

আন্তঃস্বরীয় এবং অন্ত্য -ট এর রূপান্তরও বিচিত্র। যথা–

ট ঃ দ – আদাজর (৭৮); কুদি (কোটি)। [মো গছা]
ঠ ঃ দ – আদার (১৮),
-ট ঃ চ্ – সাইদ, ষাচ্ (৬০)। [যোগেশ বাবু ষ বর্ণ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন স্পষ্ট নয়।]
-ট- ঃ ড় – কুড়ি (কোটি) [কারবোয়া গছায় বিশ অর্থে কুড়ি এবং কোটি অর্থে কুটি হয়।]

উদাহরণে দ, ড় ধ্বনিগুলির উৎপত্তিমূলে আসলে মূর্ধন্য ধ্বনির অভাব। তালব্য ধ্বনিগুলিও অস্থিতিশীল বা স্বাধীন ব্যবহারমূলক। এইভাবে ধ্বনিগুলির রূপ ও পরিবর্তন ধারা নিম্নরূপ-

১। ট ——— -চ্ (অন্ত্যে)
২। ঠ ——— দ (আন্তঃস্বরীয় অবস্থানে, উচ্চারণ দন্তমূলীয়, দন্ত্য নয়)
- - - -ড় (আন্তঃস্বরীয় অবস্থানে, বিকল্প অর্থাৎ ট> ড>ড়)
৩। চ ——— চ
৪। ছ ——— স,চ (দ্রষ্টব্য, 'সপপান্ন'- ৫৪; বিপ্রতীপে ছাপপান্ন-৫৬)
৫। শ, ষ, স ——— স, শ (বিশেষ ক্ষেত্রে গ, দ যথা - 'কাম্মান সেগ গত্')

উল্লেখ্য, লিখিত তথ্যে যে সব স্থানে স পাচ্ছি, সেখানে ভিন্ন উল্লেখে ছ-ও দেখা গেছে। এই ভেদ-বৈচিত্র্যকে Unstableও বলা চলে।

মহাপ্রাণতা সর্বক্ষেত্রেই ক্ষীয়মান, দুর্বল। দ্রষ্টব্য চাকমা ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বরীয় (এবং স্বরাঘাত যুক্ত?) সবলতা দুর্লক্ষ্য নয়, যথা-আভো, ভঙ, ভাঙ, ভাজ, ভাত, ভেইপুত, ভোন। চাকমাতে ছ > গ (যেমন আছে = আগে) এবং শ >-ক্ষ-ধ্বনিরূপও শোনা যায়, যথা মক্ষা (মশা)। তঞ্চঙ্গ্যা-তে তেমন নয়। যেমন 'ওক্ষা' অর্থে চাকমায় 'অক্ষা' কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যাতে 'অসা', সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যান্য ধ্বনি সম্পর্কে যোগেশ বাবুর কোনও উক্তি নেই, আগ্রহও নেই। তবে কি সেগুলি বাংলা ধ্বনির সমান্তরাল? এ প্রশ্নের উত্তর দুইভাবে পাওয়া যেতে পারে। এক, অন্য কোনও লেখকের বর্ণনা, এবং/অথবা দুই, চাকমা ভাষার সাথে এই ভাষার তুলনা।

(খ) বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা

প্রথমে দেখা যাক আর কোথাও এ ভাষার পরিপূরক তথ্য কিছু মেলে কিনা। তঞ্চঙ্গ্যা সম্পর্কে রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (২০০০) এবং বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা (১৯৯৫)র আলোচনা দেখা যাক। বীরকুমারের মন্তব্য এইরূপঃ

১। 'তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষা সম্ভূত বাংলার আদিরূপের সমতুল্য। বহু পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দে তাদের ভাষা পরিপূর্ণ।' (৫ পৃঃ)

মন্তব্য ঃ প্রথম বাক্যটি প্রমাণ সাপেক্ষ, কিন্তু লেখক কোনও প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। দ্বিতীয় বাক্য ভারতের যে কোনও আধুনিক ভাষা সম্পর্কে কমবেশী সত্য।

২। 'তাদের ভাষা বিকৃত বাংলা।'...

মন্তব্য ঃ ফেইরীর এই অনুমান সঠিক নহে। তাছাড়া, লেখকের আলোচনা নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে, তাই ভাষা আলোচনায় তিনি এর বেশী অগ্রসরও হন নি।

৩। 'তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার মূল উৎস হচ্ছে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইত্যাদি আর্য ভাষা। এই সকল ভাষা থেকে বহু শব্দ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সৃষ্টি।' (৩০পৃ.)

মন্তব্য ঃ সব ভাষারই মূল উৎস একটাই হয়, একাধিক নয়। তাছাড়া পালি, সংস্কৃত এগুলি কৃত্রিম ও সাহিত্যিক ভাষা, পরে মৃত ভাষা। 'প্রাকৃত ভাষা' সজীব বটে, তবে প্রাকৃত ভাষা এক এক অঞ্চলে এক এক নামে পরিচিত ছিল। লেখক স্পষ্টভাবে বলেন নি কোন প্রাকৃত থেকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু স্বীকার করেছেন–

৪। ক. 'চাকমা ভাষার সঙ্গে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার ঘনিষ্ঠতা সমধিক।' (৩০পৃ.)
খ. 'বহু বাংলা শব্দ অবিকৃত অবস্থায় কিংবা আংশিক পরিবর্তিত হয়ে সরাসরি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং এই প্রবেশের ধারা অব্যাহত রয়েছে।' (৩০পৃ.)

লেখক ৫টি শব্দ দ্বারা তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যথা,– মানাই ('মানুষ'. সং.) মেলা ('মহিলা', সং)
(১) সংস্কৃত ঃ মানাই (<মানুষ); মেলা (<মহিলা)। করা/কথা (<কথা)
(২) পালি ঃ উচু/উছু (<উজু); চিত্ (<চিত্তং)। এরপর তিনি বহু অনার্য এবং বিদেশী শব্দেরও উদাহরণ দিয়েছেন।

আমাদের মন্তব্য ঃ 'কথা'র সংস্কৃতরূপ অপেক্ষা পালিরূপ তঞ্চঙ্গ্যার নিকটতর। লেখক তা উল্লেখ করেন নি কেন বোঝা যায় না। উজু শব্দ বাংলা উপভাষাতেও আছে তাও তিনি দেখান নি। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য যে এখানে কথা> করা, অর্থাৎ থ ধ্বনি (স্পৃষ্ট ধ্বনি) কেন কম্পন ধ্বনির বিকল্পতা পেল তা বর্ণিত হয় নি। এছাড়া পারং= পাঅং এই বিকল্পতা লক্ষ্য করেও

তিনি তার ব্যাখ্যা থেকে বিরত থেকেছেন এবং আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই রূপ উদ্বৃত্ত ধ্বনি লভ্য তার সন্ধানে উৎসাহ বোধ করেন নি। লেখকের গছাতে 'কথা'-কে 'কধা' এবং 'উজু'কে 'উচু' উচ্চারিত হলেও কারব্যা গছায় এই উচ্চারণ আরও পৃথক যথা– কদা ও উসু (যথাক্রমে)। লেখক বীরকুমার এই ভাষা সম্পর্কে আর কোনও তথ্য দেন নি।

(গ) রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা (২০০০ঃ ৬২–৬৫ পৃ.) এই ভাষার নিজস্ব শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন কিন্তু ভাষাবৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলেন নি। অন্যান্য গছা (গজা)য় শব্দগুলি আছে কিনা বা উচ্চারণ ভিন্নতা ঘটে কিনা তাও উল্লেখ করেন নি তিনি। এইভাবে তাঁর গ্রন্থে কিছু সংকীর্ণ ব্যবহারী শব্দ, শস্যনাম, দ্রব্য নাম প্রভৃতি এসেছে যা অন্য গছায় অপরিচিত। যথা-

রতিকান্ত ঃ পিলাং (বোতল), রোয়া (গ্রাম), মুক (স্ত্রী), ড়য়াং (নিরুদ্দেশ) ইত্যাদি।

কিন্তু কারবুয়া গছায় শব্দগুলি যথাক্রমে – বোদল, আদাম, ইত্যাদি, ড়য়াং শব্দটি সম্পূর্ণ অজানা, মুক শব্দের উচ্চারণ 'মুগ'। এইভাবে মানুষ = মানুইদ (রতিকান্তের মতে যা 'মানাই') এবং চিত (চিত্ত)= চিদ্ ইত্যাদি।

তাঁর প্রদত্ত উদাহরণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ল-এর স্বরাঘাতযুক্ত উচ্চারণও বিচিত্র, যথা–, ল্লং, ল্লাং, ল্লাঙ্গং ইত্যাদি। এবং ড়-এর আদ্য অবস্থানিক রূপও ('ড়য়াং') প্রশ্নযোগ্য। অন্ত্য অবস্থানে-'ম্ব' দেখিয়েছেন তিনি একাধিক শব্দে, যথা–টুকাম্ব (টুপি), ম্ব (হতভম্ভ) প্রভৃতি। অন্য ধ্বনিসমূহ নিম্নরূপ।

-র- > লোপ, যথা ধআ (ধরা), গঅ (ঘর), মএ (মরে অর্থৎ আমারে); ব-মুগ (বড় মুগর;

-র্দ - > শূন্য বা লোপ, যথা 'গাঙকুএ' (গাঙ((এর)) কূলে);

র্ল- > ল্ল, যথা ধুল্লে (ধরলে)ঃ 'ধুল্যে ধআ যায় চেলে দেগা ন যায়' (অর্থাৎ - ধরলে ধরা যায়, (কিন্তু) চাইলে দেখতে পায় না।) 'ধুল্যে এক মুত, মিল্যে প্যাংজগা' – (অর্থাৎ, ধরলে এক মুষ্ঠি কিন্তু মেলে দিলে মাঠ ভরে যায়। (জাল অর্থে))

-র > লোপ, যথা শুগ (শুকর) –'চাল আগাত ব-মুগ, যে বাংগে ন পাএ তে ব-শুগ।'

অর্থাৎ চালের আগায় বড় (একটা) মুদগর, যে ভাঙতে পারে না সে বড় শুকর। (চাল কুমড়া)। গাইছ (গাছের) আগাইত পানির খ্যা। (অর্থাৎ, গাছের আগায় পানির কুয়া। (ডাব)

এখানে উল্লেখ্য যে গছায়-গছায় এর ভেদ দেখা যায়। আমরা প্রাপ্ত লিখিত রূপগুলির পাশে স্থানে স্থানে ব্যাতিক্রম বা ভিন্ন রূপগুলিরও উল্লেখ দেখাতে চেষ্টা করবো। যেমন কারব্যা গছায় র--লোপ প্রায় দেখা যায় না-যদিও বিভক্তি চিহ্ন ক্ষেত্রে diactic mark-এর ভিন্নতা দেখা যায়, যথা গাঙ + এর কুল + এ = গাঙকুএ (মো-গছা); গাঁওকুলত (কারব্যা)। এছাড়া অন্যত্র কারব্যা গছায় র-লোপ বিরল যথা– বর, শুঅর, দরা, গর, মরে। মহাপ্রাণতা নেই বা দুর্বল (ঘোষ ধ্বনিতে নেই), যথা– দৈল্লে (ধরলে) এবং গাছ অর্থে গাইত, পাখি = পাইদ। এছাড়াও যেমন, চাকমা-তে Pre- aspirated বা পূর্ব-মহাপ্রাণিত ধ্বনি হ্‌ল ও হ্‌র আছে (দ্রষ্টব্য, সুগত চাকমার গ্রন্থাদি), তঞ্চঙ্গ্যায় তেমনটা নেই। যথা– চাকমা ঃ করহ্লা, মোহ্র ইত্যাদি। যাইহোক, ধ্বনি পরিবর্তনের এলাকাগুলি মোটামুটি উল্লিখিত ক'টা ধ্বনি কেন্দ্রি বলেই মনে হয়, অন্ততঃ প্রদত্ত উদাহরণ সমূহে। এছাড়া তিনি কিছু অনুস্বার-প্রবণ শব্দেরও উল্লেখ করেছেন, যথা–

(১) অন্ত্যে ঃ আক্যাং, আলং, কুরং, ক্যাং, কিচিং, খং, খবং, খুং, গআং, গুচাং, ঘেইং, চান্দিং, চিং, চুচ্যাং, টং, টামাং, ড়য়াং, ঠুরং, তাং ধেং, পাং, পিসাং, পৈরাং, ফং, ফুল্লাং, ফেসাং, বচং, ভং (পাগড়ী), মং, মংচাং/ মৈসাং, মেচাং, মোসাং, যেবং, রিং, রেইং, লাং, সাদাং, স্যাং, য়্যাং ইত্যাদি।

(২) মধ্যাবস্থানে ঃ খংগং, খিং করং, চাংচি, জিংকানি, টাংখোয়াইন, ফুংগ্রী, বাংখু, বাংখুরি, ম্রাঙো, লাংডা, ল্লংচেইং, য়্যাংয়্যাং ইত্যাদি।

৩। মাঠ-কর্ম ও তথ্যের তুলনা ঃ

আমার তথ্যদাতা পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা ও কর্মধন তঞ্চঙ্গ্যা (বড়ইছড়ি, কাপ্তাই, বর্তমান বয়স–২২,২১, গছা– কারব্যা/ কারব্যুয়া)-এদের থেকে আমি যে তথ্য লাভ করেছি, তা' নিম্নরূপ ঃ

১. তঞ্চঙ্গ্যা স্বরধ্বনি

তঞ্চঙ্গ্যা স্বরধ্বনির সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বাংলা স্বরধ্বনির মতই। তবে এ্যা ধ্বনি প্রান্তীয়। বিশেষত মূর্ধণ্য ধ্বনির প্রতিবেশে স্বরধ্বনির অর্ধ ও পূর্ণ আনুনাসিক রূপও দেখা যায়। যথা, টৈঁয়া (যদিও 'টিক্যা' রূপও দেখা যায়), চাঁন ইত্যাদি; তবে এই আনুনাসিক ব্যবহার কম। অতিরিক্ত একটি স্বরধ্বনি প্রতীম অঘোষ ধ্বনির ব্যবহার কিছু শব্দে উপস্থিত, যাকে বর্ণনার অভাবে ও গুজরাতী প্রভৃতি মধ্যভারতীয় কিছু ভাষার বর্ণনার মতো করে অঘোষ কোমল হ- স্বরধ্বনি রূপে ভাবা চলে, যথা-

আদ্যে	ঃ	হ্‌আইদ্	অর্থ ঃ হাতি
বদ্ধাক্ষর ও অন্যত্র	ঃ	পাইহ্‌দ, রাইহ্‌ত	অর্থ ঃ পাখি, রাত

আদ্য ভিন্ন স্থানে দীর্ঘ ধ্বনির উত্তর স্বাধীন বিকারেও এর ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, যথা– রাঃইত।

হ্-স্বরধ্বনির কথা ভারতের পুনা-স্কুলেও স্বীকৃত এবং তা ইংরেজি বর্ণমালার এইচ (h)-এর নীচে ফুটকি বা গোল বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয় (যথা ḥ)।

২। তঞ্চঙ্গ্যা ব্যঞ্জন ধ্বনি

প	ফ	ব	ম		
ত	থ	দ	ন	র	ল
চ	-	জ	(ঞ)	য	
ক	খ	গ	ঙ		
স				(হ)	

() = প্রান্তীয় ধ্বনি সূচক।

হ্ প্রান্তীয় ধ্বনি এবং লোপ প্রবণ (কিংবা উহ্য ধর্মী)। 'মেলা' (মহিলা), 'মেহ্লি দ'ান' (বিশেষ এক প্রকার ধান), 'হ্আগা' (পায়খানা) প্রভৃতি উদাহরণে তার প্রমাণ মেলে। প্রবাদমূলক বাক্যে তা আরও স্পষ্ট–

(১) একক ধ্বনির পূর্বে ঃ 'চিদ্ গম উলে, লাঙর পআ বাছে।'
(চিত্ত পবিত্র হলেও প্রেমের সন্তান অবাঞ্ছিতই দেখা হয়।)

এখানে ছ ('বাছে' রতিকান্ত উদ্ধৃত) = স উচ্চারণই সম্ভব মনে হয়।

(২) দ্বৈতস্বরের পূর্বে ঃ

রতিকান্ত ঃ 'নিজর চুক কানা ঔক, দেইত কানা ন ঔক।'
পলাশ ও কর্মধন ঃ 'নিজ চোক্যায়া কা-ন ওক, দেস্তান কা-ন ন ওক।'
(নিজের চোখ কানা হোক, দেশ কানা না হোক।)

(৩) নাসিক্য ধ্বনির বা ট-বর্গীয় ধ্বনির প্রতিবেশে ঃ

পলাশ ও কর্মধন ঃ গাইদে গাইদে গলা, আদিদে আদিদে নলা।'
কিন্তু রতিকান্ত ঃ 'গারে গারে গলা, হ্আট্টে হ্আট্টে নলা।'
(গাইতে গাইতে গলা আর হাঁটতে হাঁটতে নলা।)

সাধারণভাবে অশ্রুত বা উহ্য এই ধ্বনিটির ব্যতিক্রমী ব্যবহার ফিরে আসে বিদেশী শব্দে, যেমন–
'জামেই এক হারাম। বিলেই এক হারামঃ'

কিন্তু কারব্যা গছায় (পলাশ ও কর্মধন) সেখানেও ব্যতিক্রম, যথা–'জামাই এ্যাক আরাম, বি-লি আর্যোক আরাম।' এছাড়াও খ/হ্ ব্যবহারও সাধারণ।।

র ধ্বনির অবস্থানটিও বিচিত্র বা নানামাত্রিক ঃ

(১) আদ্যে ঃ 'সনি দসা রাহ্ দসা।'
আন্তঃস্বরীয় ঃ 'কুল থাগরে ঘার, সময় থাক্কে হআর।' পলাশ ও কর্মধন অবশ্য এখানে র স্থলে দ হয় বলেছে।
অন্ত্যে ঃ পলাশ ও কর্মধন ঃ গাঁ-ও পারত গর্..... । / (রতিকান্ত ঃ 'গাঙর পারত্ ঘর, নিত্য তার ডর ডর।')

(২) (সম্বন্ধ) কারক চিহ্ন (এর,র) যুক্ত না হয়েও কিংবা অন্য কারক চিহ্ন বর্তমানেও র লোপ সাধারণ, যথা–
গর ইন্দুর্ বেরা কামারান। (পলাশ, কর্মধন) / 'ঘ উন্দে বেচাগা কামায়' (রতিকান্ত)
= ঘরের ইঁদুরে বেড়া(টা) কামড়ায়।

(৩) এছাড়াও ঘর, তার, চোর, বান্দর এবং ষষ্ঠীবিভক্তি 'এর' যুক্ত সমাসবদ্ধ শব্দ প্রভৃতি শব্দে র-লোপ সাধারণ, যথা–
পলাশ ও কর্মধনঃ 'গর বরা পোয়াসোয়া।' / রতিকান্ত ঃ ঘ ভরা পআ ছআ ।– (ঘর)

পলাশ ও কর্মধন ঃ – সুচ্যাং বাজ্যায়া তা বুঅত।/রতিকান্ত ঃ – ছুচ্যাং বাক্ষুয়া তা বুগত। (অর্থ-বুকে চুক্যা বাঁশ)

কোনও কোনও গছায় (কারব্যা গছা ভিন্ন) এইভাবে চু (চোর), বান্দ (বানর), তিন প (তিন প্রহর), ঠাগুবা (ঠাকুর), দৈপেলা (দৈ-এর পাত্র) ইত্যাদি সাধারণ। ট-বর্গীয় ধ্বনি স্থলে আন্তস্বরীয় অবস্থানে- ড়- হয়, (তবে তা র-ধ্বনির যথার্থ প্রতিযোগী নয় বা স্পষ্ট মূল ধ্বনিরূপে অবস্থানগ্রহণ করে না। কেবল মো-গছায় তার অবস্থান স্বতন্ত্র)। আদ্যে র্র (দ্বিত্ব অথবা দীর্ঘব্যঞ্জন-গুণান্বিত) এর স্বাধীন বিকারেও ড়-ব্যবহার সম্ভব। কোথাওবা ড়-এর উহ্যপ্রবণতাও অধিক। কয়েকটি ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ঃ ব (বড়), কুদি (কুড়ি)। মো -গছায় 'বড়' নেই কিন্তু 'কুড়ি' (কোটি) আছে। চাকমার মতো এখানে তালব্যীভবনও ঘটে, যথা – রতিকান্ত 'কামাজ্যা' শব্দ ব্যবহার করেছেন (অর্থ- কামারের, পৃ.৭৭) কারব্যুয়া গছাতেও তাই। এছাড়া পাই বুইজ্যা (বুড়া)। রতিকান্ত উল্লিখিত তঞ্চঙ্গ্যা শব্দ 'অমগড়' (পৃ.৬৩) মাড়াত (পৃ.৭৭) স্পষ্টতই ব্যতিক্রমী মনে হয়।

শিস ধ্বনির ক্ষেত্রে - 'শ' ধ্বনির মান 'স' এর প্রতিযোগী হিসাবে দেখানো হয়, যথা,
'দশর মুএ জয়, দশর মুএ খয়।' বা 'শনি দশা রাহ্ দশা।'
(এখানে রতিকান্ত উল্লিখিত রূপে শ-এর উচ্চারণ অস্পষ্ট, কিন্তু পলাশ ও কর্মধনের উচ্চারণে তা' স, যথা– সনি এবং দসা।)

ছ ধ্বনিও স-এরই উপধ্বনি বা প্রান্তীয় এবং স্বাধীন বিকার। রতিকান্ত লিখেছেন (পৃ.৭৪)ঃ 'ঘ ভরা পআ ছআ।' এখানে

তিনি ঘ, ভ, ছ বর্ণ ব্যবহার করেছেন যার প্রত্যেকটি মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রতিরূপ। তার উপর আছে ছ-এর যথার্থ উচ্চারণ নির্ণয়ের সমস্যা। এভাবে তিনি গাইছ (গাছ), ছাগল, ছ (বাচ্চা), আছা (আছাড়), ছাল্যাং (ছাড়লাম), পিছে (পিছে) প্রভৃতি শব্দে ছ-এর ব্যবহার দেখিয়েছেন, অথচ মজার ব্যাপার যে, 'উচু আঙুলে ঘি ন উরে' (সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না), 'গাইত চিনে বাগলে' (গাছ চেনা যায় বাকলে) কলাশ্চয়া (কলার ছড়া), বাশুয়া (বাঁশটা) প্রভৃতি শব্দে এর ভিন্নতাও অস্পষ্ট রাখেন নি তিনি। আমার তথ্য দাতারা কারবুয়া গছায়ও এসব ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখিয়েছেন, যা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।

ট-বর্গীয় ধ্বনি নেই, তবে নব্য প্রবণতায় (কারব্যা) টৈয়া/টৈয়া প্রভৃতি শব্দে এবং প্রবাদে 'এক কুবে হাজার টিক্যা ন শেষ' (এক কোপে হাজার টাকার নৌকা শেষ) প্রভৃতি ক্ষেত্রে ট লক্ষ্য করা যায়। এগুলি ঋণ শব্দজাত প্রভাব।

ত- বর্গীয় ধ্বনি চাকমাদের দন্তমূলীয় ত বর্গীয় ধ্বনি থেকে সামান্য পৃথক। 'শ' একটি প্রান্তীয় ধ্বনি। তবে ব্যবহার খুবই সীমিত ঃ 'কবা শে বগা' (কাকের মাঝে বগা)। যোগেশ বাবু একে ষ বর্ণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, তবু তাতে শ-এর ধ্বনিগুণ রক্ষিত কিনা স্পষ্ট নয়। মহাপ্রাণতা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। ফ থ এবং খ ব্যতীত তা সর্বত্র দুর্বল বা অতিক্ষীয়মান। আন্তঃস্বরীয় অঘোষ ধ্বনি ঘোষতাপ্রাপ্ত হয়, যেমন – ছাদি (ছাতি), তাগল (দা) প্রভৃতি। উল্লেখ্য মো গছায় প্রথম শব্দটির রূপ ছাতি/ছাড়ি/ছাড়া রূপেও লভ্য। দ্বিতীয় শব্দটি কারব্যা গছায় 'তাগুল'।

৩। টোন বা স্বরতান ঃ

টোন বা স্বরতান দুটো, উচ্চ যা বহু ক্ষেত্রে মধ্য স্বরতানের সাথে নিরপেক্ষ; এবং নিম্নস্বরতান। যথা–

১। তুই খাবে? (উচ্চ)
২। ত্রি, খাইং (উচ্চ, মধ্য)
৩। ন খাং (নিম্ন)

তৃতীয় উদাহরণের দ্রুত উচ্চারণে 'ন হাং' পাওয়া যায় কোনও কোনও গছাতে। উচ্চস্বরতানের অভাব বা ক্ষয়জাত পরিবর্তনের ফলেই তা ঘটে বলে অনুমিত হয়।

৪। দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার ঃ

দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার আছে, যথা– আসিঃ গিয়ো। (হারিয়ে গেছে)। বাঃই (ভাই)। দীর্ঘস্বর মহাপ্রাণতার ক্ষীয়মানতা বোধক। – শব্দের শুরু এবং শেষে র, ন, ম প্রভৃতি ধ্বনির দ্বিত্বতা বা দীর্ঘত্ব সূচক উচ্চারণ সম্ভব, যথা - হ্লং, ম্ম, ইত্যাদি। (যেমন – 'ম্ম' গরুর লাড়ি ডাং' –অর্থাৎ স্থির গরুর লাথি ভীষণ।)

৪। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা তুলনা

(ক) ধ্বনির তুলনা

শব্দ কোষে চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যাতে কোথাও কোথাও পার্থক্য ধ্বনিভেদগত। অবশ্য ভিন্ন শব্দ ব্যবহারও প্রচুর। যেমন পোই বা পৈ মানে 'ধারালো বাঁশের বর্শা' (চাকমা) এবং 'উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠান' (তঞ্চঙ্গ্যা)। নিম্ন উদাহরণগুলি সাধারণ, তবু এখানে চাকমা ধ্বনির সাথে তুলনায় কয়েকটি পার্থক্য বা পারস্পরিক ভিন্নতা ধরা পড়বে। –

চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা		মন্তব্য	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা		মন্তব্য
কুদু, কুধু	কুদি, কুরি	– ঃ	উ/ই ; দ/র	হিয়াচ	খাইয়ৎ/খিয়ৎ	– ঃ	হ/ খ ; চ/ৎ
হিয়াচ	খাইয়ৎ/খিয়ৎ	– ঃ	ই/আই	আজি	আসিঃ /আরি	– ঃ	জ/স, র
বেই	বা'ই/ভাই	– ঃ	এ/আ ; ব/ভ	জিয়ো	গিয়ো	– ঃ	জ/গ
বোন	বইন/বোঞ	– ঃ	ও/অই ; ন/ঞ	উনজ	উনচ্‌	– ঃ	জ/চ
আগ	আহ্‌, আয়	– ঃ	গ/হ্‌, য়	ধুরুং	ঠুরুং	– ঃ	ধ/ঠ

তঞ্চঙ্গ্যা পাঁচ অর্থে পাইদ (চ > দ) এবং পাখি অর্থে পাইৎ (খ্‌ > ত) উভয়ত দন্তীভবন স্পষ্ট। চাকমা ভাষায় এক্ষেত্রে পাখি অর্থে ' 'পোখ' বা পেইক) এবং পাঁচ অর্থে 'পাচ,' ব্যবহার হয়। হ–ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বল্প বা ক্ষয়িত মহাপ্রাণ ধ্বনি আভাসিত।

(খ) রূপতাত্ত্বিক কয়েকটি বিশেষত্ব

	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
নেতিবাচক শব্দ গঠন ঃ	অগদা (অ-কথা বা কুথা অর্থে)	অকদা
	নিলচ (নির্লজ্জ অর্থে = নি + লাজ)	লাইত্‌নাইয়া
	বেদিজা (বেদিশা অর্থে)	বিদিসা
নির্দেশক চিহ্ন ঃ	-উয়া (যথা, মিলাবুয়া = মিলা-উয়া)	ম্যালাবা
	- আন (যথা লুদিয়ান = লুদি -আন)	লোদিয়ান, বিসইনান
বহুবচন চিহ্ন ঃ	- উন (যথা, মানুক্কুন, পিলাউন)	মানুক্কুন, পেলাউন / সউন (নিকটার্থে)
	- আনি (যথা, লুদিয়ানি, বিজোনানি)	লোদিয়ানি, বিসইনানি
	- নি (X)	স-নি / সঅনি (দূরার্থে)

সংযোজক অব্যয় স্থলে 'সাথে' বাচক শব্দ ব্যবহার :

	+ লই (যথা, তাল্লোই মুই =	তাল্লোই মুই
	তে + লই < লগে + মুই = 'সে ও আমি')	

সর্বনাম রূপ (এক বচন ও বহুবচন) :

	মই/আমি	মুই/ আমি
	তুই / তুমি	তুই /তুমি
	তে / তারা	সে, ত্যে / তারাই
	ইয়ান / ইয়ানি	ইয়্যান / ইয়্যোনি
	ইবা / ইউন	ইবা / ইউন
কারক চিহ্নাদি :	শূন্য (১মা) = মানুচ্	মানুইত
	রে (২য়া) = মানুজরে	মাইনসরে
	দি/ওই (৩য়া) = মানুচদি, মানুচচোই	মানোইদদি, মানোচ্চোই
	তুন (৫মী) = মানজত্তুন	মাইনসত্তুইন
	র (৬ষ্ঠী) = মানুজর	মাইনসর
	ত্ (৭মী) = লুদিত, পিলাউনত, বিজনোত্ ইত্যাদি।	লুদিআনত, পেলাউনত, বিসইনানোত

ক্রিয়ার রূপ [1] : ক্রিয়ার কাল ও ধাতুরূপ (এখানে খাওয়া অর্থে খা ধাতুর রূপান্তরণ রূপ) :

সাধারণ / স্থিত বর্তমান (এক বচন / বহু বচন) =

	খাং / খেই (এইভাবে আগং, লং, গরং বা দেখ্যং ইত্যাদি)	খাং / হেই
	খাচ / খ (আগচ / আগ)	খাইত্, হাইত্ / হ
	খায় / খান (আগে / আগন) ইত্যাদি	খায় / খান
চলমান বর্তমান =	খাঙর /খের, খেইর (এইভাবে লঙর ইঃ)	খাঙর / হের
	খর্ / খর্	হর্ / হ-র্
	খার্ / খাদন	খার্ / খাইদন / হারন
পুরাঘটিত বর্তমান =	খেলুং / খেলং (এইভাবে এলুং, লোলুং, গোল্লুং ইঃ)	হাইয়ং / হাইয়্যি, হালং
	খেলে / খেলা	হাইয়্যাচ্ / খাইয়্যা
	খেল / খেলাক	হাইয়্যো / হাইঅন
অতীত সাধারণ =	খেইয়াং / খেইয়োই (এইভাবে লোইয়াং বা দেখ্যাং ইঃ)	খাইয়ং / হাইয়্যি
	খেইয়াচ্ / খেইয়া	হাইয়্যিত্তে / হাইয়্যাদে
	খেইয়ো / খেইয়ান	হাইয়্যো /হাইয়্যান
ভবিষ্যৎ সাধারণ =	খেম, খেইম / খেবং (এইভাবে লোম, গোরিম ইঃ)	হাইন / খাবং
	খেবে / খেবা	খাবে / খাবে, খাবা
	খেব / খেবাক	হাব / হাবাক

লক্ষ্যণীয় যে, ক্রিয়ার সাথে ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয়সমূহ নানাবিধ Morpho-phonemic পরিবর্তন রূপ লাভ করেছে, যথা-ব>ম>ন, কিংবা খা>খ, খে। এগুলি পরবর্তী ধ্বনির সাথে ও পরিবেশে সম্পন্ন রূপ।

(গ) তঞ্চঙ্গ্যা সংখ্যা শব্দ (নির্বাচিত) :

ব্যাকরণে সংখ্যাশব্দের গুরুত্ব ঐতিহাসিক, বাক্যতত্ত্বেও তা তাৎপর্যপূর্ণ। সংখ্যাশব্দকে বলা হয় 'ভ্রমণশীল'। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় সংখ্যাশব্দ কোনও না কোনও ভাবে বা পর্যায়ে বৈদেশী প্রভাবিত, ঋণাত্মক অথবা সাদৃশ্যে গঠিত। এছাড়া এর ব্যাকরণী দিক যথেষ্টই জটিল। (এ বিষয়ে লেখকের আলোচনাসমূহ তাঁর 'ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন' ও 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা' গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।) উদাহরণত এখানে উল্লেখ করে প্রতিতুলনা করা যায় যে বান্টু ভাষার একটি উপশাখায় ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যা ধাতুরূপক, ১০ পর্যন্ত বাকী শব্দ পূর্ণাঙ্গ ও 'Self Standing'। তঞ্চঙ্গ্যা সংখ্যা শব্দে বিশেষণী রূপ বা বিশেষণাত্মক ব্যবহারই অধিক লক্ষ্য করা যায়।

কারব্যা	মো গছা (সূত্র : যোগেশ তঞ্চঙ্গ্যার গ্রন্থ)	চাকমা (চিরজ্যোতি ও রিতেল চাকমা, চ. বি সূত্র মতে)
এক	এক	এক
দুই / দ্বি	দ্বি (দিঃ= ?)	দুই
তিন	তিন	তিন
চাঁর	চায়	চের
পাচ / পাইদ	পাচ্	পাচ্
স/ছয়	ছোয় (লিখিত রূপ; আসলে 'সোয়'?)	ছ
সাদ	সাত্	সাত, সাদ্
আট / আইত্য	আত্ত্য	আত্তু
নয়	নয়	ন
দয়েৎ	দচ্	দত
সোইদ্য/সইদ্য	সোইদ্য	সোদ্য
পনর	পনর	পনদর
সুল/শুল (?)	শুল (লিখিত ষুল)	সুলো, সোলঅ
আদার	আদর	আদর
উনিৎ	উনচ্	উনিজ
(এক) কুরি	কুড়ি	হুড়ি
তিরিত	ত্রিচ্	তিরিশ, তিরিছ্
চল্লিত	চল্লিচ্	চাল্লিশ, চালিছ্
পঞ্জাইত	পঞ্চাচ্	পঞ্চাজ, পঞ্জাচ্
সাইত	শাচ্ (লিখিত ষাচ), হাইত্	হেইট
সত্তর	–	সত্তর, হত্তুর
আসি	আশি	আজি
নব্বই	–	নব্বই
একসত	একশত	একশত, একশ
আজার	আজাদ	আজার, হাজার

উল্লেখ্য চাকমা-তে 'শ'- ধ্বনি নেই, এখানে মো-গছায় আছে বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন–শসা। এখানে শাচ (৬০), আশি (৮০) শত (১০০) শব্দগুলিতেও তার প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়।

৫। বাক্য ও শব্দকোষে নব ব্যাকরণী উপাদান ঃ

ধ্বনাত্মক ও দ্বিরুক্তি শব্দ ঃ

'ভাষার খেয়াল' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে ভাষায় যে শব্দ থাকে তা 'বাছাই শব্দ', এবং সব সময় তা 'যোগ্য শব্দ' নাও হতে পারে। এর ফলে অনেক পুরনো শব্দ বিদায় হয়, আবার নুতন শব্দ - বিদেশী বা সৃজিত-সেগুলি আসে। যুল ব্লখ যখন বলেছিলেন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী আছে বটে, কিন্তু তাদের সীমানা শেষ পর্যন্ত আর সীমিত থাকে নি, তাদের পরস্পরের মেলামেশি, হাত ধরা ধরির কারণে সম-সম্মিলন ঘটেছে, তখন আসলে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। 'ভাষা-এলাকা' বোঝাতে গিয়ে ইমেন্যু সাহেবও আরও পরে বুঝতে পারেন, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (তথা 'ভারতবর্ষের') ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ এলাকায় ও ভাষাভাষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এইভাবে তিব্বতী-বর্মী ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য আর্য ভাষাতেও ঢুকেছে বলে সম্প্রতি দাবী করেছেন ইম্ফল-মনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভাষাতাত্ত্বিক। বার্মা ভাষায় নেই এমন কিছু তিব্বতী-বর্মী ভাষিক বৈশিষ্ট্য ভারতীয় ভাষাগুলির এখন আয়ত্তে। মূল আর্য ভাষায় ছিল না এমন একটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ধনাত্মক শব্দ। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় এর উদাহরণ দেখা যায় এবং তার রূপ বা প্রকারও বৈচিত্র্যময়। এটি ভাষা-সংযোগ ও মিশ্রণের ফল। অথবা অতীত রেশ। এ বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা যোগ্য। এখানে কিছু উদাহরণ সংকলিত হল, যথা–

১। সঙ্ঘ নামে ঃ ফরা তারা সঙ্ঘ
২। স্থান নামে ঃ দুম দুম্যা (সীমান্ত পারের একটি গ্রাম)
৩। উবাগীত (প্রার্থনাংশে) ঃ আগাইত্ বাতাইত্, চন্দ্র, সূর্য, বন, বিক্ষ দেবগণ....

৪। বিশেষণে : উম উম (সামান্য গরম);
চিক চিক্যা (নিঃসঙ্গতা); চুচ্যাং ('তীক্ষ্ণ')।

৫। ক্রি. বিশেষণে : গাই গাই বা, গায় গায় ('একা একা'), ভুলুক চুলুক ('ফাঁকি ঝুঁকি'), তগাতগি ('খোজাখুঁজি')

৬। বিশেষ্য পদে : লাঙ্যা-লাঙনী ('প্রেমিক-প্রেমিকা'), আড়াল্যা-পাড়াল্যা ('পাড়া-পড়শী')

৭। অখণ্ড মূল শব্দে : লেলেক্যা ('অস্থির'), মগাসাসন্যা ('তিন সন্ধ্যা'- সন্ধ্যার আগে আগে), য়্যাং য়্যাং ('চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা'), কুকুরাইয়ো ('চুলকায় এমন')

৮। প্রবাদের ছন্দে ও অনুপ্রাসে : আবাইত শুনি চাবাইত চাবাইত ('আওয়াজ শুনি সাবাশ সাবাশ')/(হ্) আইসে (হ্) আইসে দলাদলি নলখাগড়া গুড়ি (হাতিতে হাতিতে দলাদলি, বাঁশ ঝাড় চূর্ণ)/উনা ভারে দুনা বল, বেগ খেলে রসাত্তল (কম ভাতে দ্বিগুণ বল, বেশী খেলে রসাতল)/ উবে উবে ব বায় (উপরে উপরে বাতাস বয়)/খেবার দেবার ন থেলে ডাইন পা (খাবার দাবার না থাকলে ডাইনের মত)/উঅন পিনন ন থেলে চু পা (গায়ে দেবার পরার না থাকলে চোরের মত)/গবে সবে মরত (গপ্পে সপ্পে মরদ)/গাঙর পারত ঘর নিত্য ডর ডর (গাঙ্গের ধারে যার বাড়ি তার সব সময় ভয় ভয়)/বান্যায় টুক টাক ও কামাজ্যায় এক বায় (বান্যার হাজার টুকঠুকানি, কামারের এক ঘা)

৯। ক্রিয়া পদে : হুঁআইত্ এলে গাইত্ তগাতগি। (হাতি এলে গাছের সন্ধান)

৯। ক। অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি রূপে : ক। কামেই কামেই (কামড়ে কামড়ে)
ভাসি ভাসি (ভেসে ভেসে)
খ। বোইয়্যা বোইয়্যা খানাত্তুন ঠাণ্ড হুঅনা গম।
(বসে বসে খাওয়ার চেয়ে ঠাকুর বা ভান্তে হওয়া ভাল)
গ। গারে গারে গলা, আট্টে আট্টে নলা
(গাইতে গাইতে গলা, হাঁটতে হাঁটতে নলা)।

১০। অন্যান্য ক্ষেত্রে : কাবর চুবর বা কাব চোব (কাপড় চোপড়); (বর্ গাঙও চানা / কাব চোবও ধআনা – প্রবাদ) মএ মএ/ মআ মআ (শীর্ণ দীর্ণ)।

এখানে যে বিশেষত্বটি লক্ষ্যণীয় তা হল যে, আম্রেড়ন-বৈশিষ্ট্য অর্জনে পাণিনি যে সব লক্ষণ ও ব্যাকরণী প্রথার কথা উল্লেখ করেছিলেন এখানে তার ব্যাপকতা ঘটেছে। যেমন দ্বিরুক্তি কেবল শব্দের অবস্থান (পদক্রম) ও পুনরুক্তিতে নয়, একই শব্দের অন্তর্গত ধ্বনির ক্ষেত্রেও ঘটেছে এবং কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণীর শব্দই নয়, অনির্দিষ্ট শ্রেণীর (বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, এমন কি সর্বনাম ইঃ) শব্দরাজিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ্যণীয় যে, শব্দগুলি ধাতুরূপ গ্রহণ করেছে, আবার তেমনি বহু ক্ষেত্রে কোনও সংযোগী চিহ্ন (Coordinating marks) গ্রহণেও বিরত থেকেছে, যদিও অর্থ স্পষ্টতায় বাধা ঘটে নি তাতে (= কাব চোব, উঅন পিনন, উনা দুনা, ডর ডর ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য।) ব্যাকরণগতভাবে অসমাপিকা বা ৭মী ভাবের রূপে যেমন এর ব্যবহার পাই; তেমনি রূপান্তরিত শব্দের দ্বিরুক্তি ক্ষেত্রেও তার সহজ ব্যববহার লভ্য। যথা– উম উম, ভুলুক চুলুক প্রভৃতি বনাম আড়াল্যা পাড়াল্যা, আগাইত বাতাইত, বইয়্যা বইয়্যা বা আট্টে আট্টে ইত্যাদি। ব্যাকরণী-রূপ গঠনে বিশেষতঃ বাক্যগঠন প্রক্রিয়ায় এর গুরুত্ব সমধিক। সম্ভবতঃ ধর্ম বা সংস্কৃতি বিস্তারের আনুকূল্য ঘটার সুযোগ থেকেই প্রান্তীয় ভাষাগুলির উন্নয়ন ঘটে থাকবে অতীতের কোনও সময়। সমবিন্দুক পরিবর্তন আর্য ভাষা ও তিব্বতী- বর্মী ভাষায় যে সব পরিবর্তন ঘটিয়েছে এটা তারই একটি উদাহরণ।

৬। তঞ্চঙ্গ্যা বাক্যতত্ত্ব :

বাক্যতত্ত্ব আলোচনার প্রধান সমস্যা তার অন্তর্গত গঠন ও সীমা এবং অর্থ-মাত্রা। বাক্যে থাকে বহু উপবাক্য, শব্দজোট, পদগুচ্ছ, স্বাধীন পদাংশে বা বাক্যাংশে। যেখানে মনের ভাব প্রকাশের পূর্ণতাই তার অন্তিম কাম্য, সেখানে গঠন কখনই প্রধান বিবেচ্যাংশে হতে পারে না। ফলে বাক্য, শব্দ ও উপপদাংশে মিল-অমিল উভয়ই সম্ভব। উৎপাদনশীল ও রূপান্তরী তত্ত্বে তা অনস্বীকার্য নয়। এই সাথে বাক্য ও সংবোচন-এর সম্পর্ক ও পারস্পরিক সীমাও সমস্যার সমাধানকে আরও দূরবর্তী করেছে। যেমন – 'উঃ, বিরক্তিকর।' অথবা, 'আচ্ছা, দেখি।' বা 'যাও, বিরক্ত করো না।' কিংবা 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' প্রভৃতি গঠন।

এগুলি বাক্য, না নিজোক্তি বা সংবোচন, নাকি একাধিক বাক্য?

বাক্যের সাংগঠনিক উপাদানগুলি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ জন্য 'ব্যাকরণী বাক্য' নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত

হতেই পারে। 'Flying planes are dangerous' কিংবা চমস্কির সেই ক্লাসিক্যাল অব্যাকরণী শুদ্ধবাক্যটি তার প্রমাণ। অবশ্য বাক্য সম্পূর্ণও হয়; অসম্পূর্ণও হয়; আবার তেমনি তার সংযোজক উপাদান, এমনকি প্রতিযোগী, সহযোগী বা অতিযোজনশীল উপাদানও থাকতে পারে। বাক্যের অসীম ক্ষমতা থাকে শোষণের, অর্থগত বা উপদানগত বিষয়ের ক্ষেত্রে। বাক্যের প্রথম উপাদান পদ, কিন্তু অর্থগতভাবে বাক্য উদ্দেশ্যাংশ ও বিধেয়াংশের একীভবন রূপ। পদ কিংবা অর্থউপাদানাংশের ক্ষুদ্রক ও বর্ধক সমূহই বাক্যের গঠন ও অর্থ, রীতি বা বিন্যাসকে ধারণ করে। যে কোনও উপাদানই বাক্যে একটা সম্পর্ক আনে, তখন বাক্য উদ্দেশ্য / বিধেয়, টপিক/কমেন্ট বা শাসক (গভর্ণমেন্ট) / শাসিত (এগ্রিমেন্ট) সম্পর্ক হয়। বাক্যের রূপ, ধারণা এবং উপাদানসমূহের ধর্ম একাধিক মাত্রা তথা অসীম বৈচিত্র্য লাভ করে। বাক্য কারক ধর্ম লাভ করে, সেও এভাবে। ('কারক চিহ্ন' পূর্বে আলোচিত)

বাক্য সম্পর্কিত ধারণার যে পরিবর্তন এসেছে এটা বুঝাবার উদ্দেশ্যে এত কথা। সীমিত উদাহরণ থেকে কোনও ভাষার বাক্য সম্পর্কিত সংগঠন ও অন্তর্গত সমস্যার তত্ত্বীয় সমাধান খোঁজা এখন একটি বিশাল ক্ষেত্রীয় সমস্যা বটে। এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত রেখে তঞ্চঙ্গ্যার বাক্য সম্পর্কিত বাইরের ধারণা গুলি সামান্য ভাবে উল্লিখিত হল। বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ তালিকা এটি নয়। এখানে অসম্পূর্ণ বা অর্ধবাক্য (ellipsis) এবং anaphora ইত্যাদিও আলোচনার বাইরে রাখা হল। সীমিত কিছু গঠন বা Construction দেখা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে 'Fused Construction' বা 'Marginal অধীনস্থতা', বিধেয় প্রসারণ, পরিপূরক গঠন প্রভৃতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়ও দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নি। অন্যান্য ঃ

১। প্রশ্ন বাক্য ঃ তুই কুদি যবে ? / তুই কি বাত হিয়্যত্ ? / তুই কি বাত হেবে ?
২। সাধারণ ঃ মুই গ'রৎ যাঙৎ / যাঙর। / মুই গিয়ং। / ত্রি, খাইন।
৩। জটিল ঃ তুই যেত্যে গরৎ যাওর, সেত্যে মুই তোরে দেই ক্যং।/স্কুলৎ তুইও যাবে মুইও যাইন।
৪। ভাববাচ্যরূপ ঃ কুদি য'অত্যে? / ম-র খা অইয়্যে। / যো গৈ। গাসৎ ফল পা'ক্যেয়ন। (কর্মকর্তৃবাচ্য)
৫। যৌগিকরূপ ঃ তুমিও মানুইৎ আর যারা রাইত্যাত্ হাম গরন তারাও মানইত্।
৬। নঞার্থক বাচ্য ঃ তে ন আইসে।
৭। সাধারণ সম্মতি প্রার্থণার বাক্য গঠন বৈশিষ্ট্য ঃ ও বুরাবুরি পারাইল্যা মানইত্ ও বুড়াবুড়ি পাড়াল্য গণ্যমান্য লোক, অমুক অমুগিরে অমুক অমুকীর লাত্তং বাণিদ্যিত্যে, জামাই-বৌ গুরি দিত্যে তারাই ন-রে তা- নে ফংগুই দিবার হুগুম ফং গরি দিবার হুকুম আহে ন্যে নাই? আগেনে নাই? (হে পাড়ার বৃদ্ধবৃদ্ধা গণ্যমান্য লোক সকল, অমুক-অমুকীর বিবাহে জোড়া বেঁধে দিচ্ছি; এতে আপনাদের হুকুম (সম্মতি) আছে কি নাই?)
৮। প্রবাদ বাক্য গঠন বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) গাইছর আহাত্ পানিই কহ্য (কারব্যা)	(১) গাইছ আগাত্ পানির খআ (মো গছা)
(২) পাইদ বাই তুলে ছাব্বিত বাই গিলে (কারব্যা)	(২) পাচ ভাই তুলে ছাব্বিশ ভাই ঘিরে (মো গছা)
(৩) দুইল্যে এক মুউৎ, মিল্যে এক বেদেরাং (কারব্যা)	(৩) ধুল্যে এক মুট, মিল্যে প্যাংজগা (৪০পৃ.) (মো গছা)

ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, চাকমা ভাষায় এখানে (১) কুদি স্থলে 'কুদু' হিয়্যত স্থলে 'হিয়্যজ', হেবে স্থলে 'হেদে', (২) যাঙর স্থলে 'যাঙর' ('যাংঅর'), যিয়ং (গিয়ং) স্থলে 'যেঅং', ত্রি-খাইন স্থলে 'ত্রি-হ্যেইম' উচ্চারণ হয়। ৭নং বাক্যটির চাকমা রূপ হবে - "ও বুরোবুরি পারাইল্যা মাইনত - ও বরাবুরি পারাইল্যা মাই মুরুব্বিউন – উমুক অমুগিরে অমুকির জোরা বানিদিত্যে জামে-বৌ গুরি দিত্যে তারাইন-রে/তা-নে জোরা দিবার হুগুম/জোরা গরি দিবার হুকুম আগে ন-নেই?/ আগেনে নেই?"

যাই হোক, এ রকম অসংখ্য বাক্যের উদাহরণ আনা যাবে, কারণ বাক্য অশেষ এবং এর কোনও অভিধান হয় না। শ্রেণীকৃত ভাবেও তা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। অর্থাৎ ভাষার তথ্য নিয়তই গবেষণা-সাপেক্ষ। তবু কোনও ভাষার বাক্য সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থেকেও মোটামুটি বিচার করা চলে। যথা সার্বজনীনতার নিয়মে SVO গঠনের ভাষার (যেমন অধিকাংশ ভারতীয় ও পূর্ব-ভারতীয় ভাষাগুলি) অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য ভাষা-সংযোগ সঞ্জাত এবং আন্তপ্রবাহিক। তঞ্চঙ্গ্যা এরকমই একটি ভাষা। তার বৈশিষ্ট্য SOV ভাষাপেক্ষা ভিন্ন। তবে তার গঠন সবই Syntactic না কিছু Semantic এবং Inherent তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে।

যেমন তঞ্চঙ্গ্যা উপমহাদেশীয় সকল ভাষার বাক্যিক নিয়মের একই ধারা অনুসরণ করে একটি বদ্ধ ভাষা হয়ে থাকবে, না তার স্বাধীনতা বা বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতা থাকবে, তা নিয়ে ভাবা যায়। সজীব কোনও ভাষারই এটা নিয়ম হতে পারে না। অবশ্য কেন, কোথায়, কতটুকু ব্যতিক্রম ও স্বকীয়তা লাভ করবে তাও স্পষ্ট থাকা চাই। কারণ ভাষায় Anarchy থাকতে

পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা ঘটতে পারে না কোনও ভাষার মধ্যেই,–নিয়মে বা শৃঙ্খলায়। এর থেকেই কয়েকটি ধারণার কথা এখানে যোগ করা আবশ্যক।

আগে বাক্যের যে তত্ত্বীয় বিষয়গুলি বলা হয়েছে তারই পরিপেক্ষিতে আমরা আর একটু স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, বাক্য বহু ধরনের গঠন এবং নানা জটিল উপাদানরাশি সম্বলিত একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রকাশরূপ বা সংগঠন যা অন্য সংগঠনের অংশ নয়। কিন্তু এর থাকে একটি নির্দিষ্ট আধার বা মাধ্যম যেখানে বা যার মধ্যে তার নিজস্ব উপাদানসমূহের বিধাসৃজন ও বিধা ভিত্তিক রূপসমূহের আন্তসম্পর্ক গঠন, ক্রম নির্ধারণ, গুচ্ছায়ন ও বর্গায়ন, বিশেষ্যায়ন, ক্রিয়াযোজ্যতায়ন ও ক্রিয়াসম্পর্কিত পদাদির অন্বয়ন, বাচ্যায়ন (যথা Active-passive relation), অন্তর্বাক্যায়ন, অনুসর্গায়ন, সম্পূরণ, প্রসারণ ও সংযোজন, এমন কি অনুক্তায়ন (ellipticisation বা Non-Agentive) এবং দ্বিরুক্তায়ন (Anaphorism ও cliticization, Clitic-doubling etc.) প্রভৃতি, অর্থাৎ যাবৎ কাজ বিশিষ্ট আকার ও রং লাভ করে।

উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহ এবং আরও অসংখ্য গঠন-সম্ভব বাক্য তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার আধারে সংস্থাপনা লাভ করেছে। SOV গঠন প্রকৃতিতে এর বাক্যিক উপাদানে ক্রিয়ার ধাতু সাধিত ও সম্প্রসারিত এবং বিভক্তিবর্গ যুক্ত (Inflexions) হয়ে থাকে। যেমন - 'মুইখাং', কিন্তু আবার - 'মুই খাইত্' অথবা 'মুই হাইত্'। কিন্তু তুলনায় ইংরেজিতে এসব ক্ষেত্রে সহায়ক ক্রিয়া (*have* Aux.) থাকে। আবার ইংরেজি তীর্যক ক্রিয়ারূপের সমান্তরাল পাই না তঞ্চঙ্গ্যায়। যেমন Come to me / 'ম' সেনৎ আয়।' এখানে পদান্বয়ী অব্যয় স্থলে ক্রিয়ান্বয়ী কারকচিহ্ন বিশেষ্য-উত্তর গঠন লাভ করেছে। SVO ভাষায়ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ (Volitive) ও যৌগিক ক্রিয়াও সাধারণ কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্মুখ ক্রিয়াটি অসমাপিকারূপ পায় ও সংযোজক (Copula) উহ্য থাকে। যথা, 'তে আইনে খাইনে খাই গিয়ো গৈ।' ('he came and ate and then went away') । এরকম ক্ষেত্রে চাকমা অধিকতর বঙ্গীয় (বিশেষত চট্টগ্রামী); বাংলায় ক্রিয়ান্ত যোগের এই রূপ নেই অর্থাৎ ক্রিয়াধর্মী অনুসর্গ যোগ হয় না।
কোথাও কোথাও (এবং উদ্ধৃত বাক্যেও) এর বাচ্য রূপের National Ergative গঠনও দেখি যার ব্যবহারী রূপ ঐচ্ছিক। তথ্য স্বল্পতার জন্য এখানে কেবল ইঙ্গিত রাখা হল সমস্যাটির।

বাক্যগঠনে ও ব্যবহারে তঞ্চঙ্গ্যাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ্য। এদের বাক্যরূপগুলি উভ বা সমলিঙ্গিক এবং স্থিতিমূলক। এদের বাক্য প্রকাশে লিঙ্গান্তরী বৈচিত্র্য নেই। তিব্বতী–বর্মীতে বা ভারতীয় আর্য ভাষা প্রভাবিত পূর্ব প্রান্তীয় ভাষাগুলিতে (মনিপুরী, তাংকুল, মেইথেই, কাবুই, থাডৌ প্রভৃতিতে) যেখানে কর্ম আগে আসে অর্থাৎ Verb-ending ভাষা, সেখানে অনুসর্গ ব্যবহার সিদ্ধ,– যদিও বিশেষণরূপ সব সময় বিশেষ্য-পূর্ব গঠন গ্রহণ করে না, যেমন হিন্দিতে আছে 'গুলে লাল' (কিংবা তাংকুল প্রভৃতিতেও অনুরূপ গঠন হয়) এবং শাসন পদে ('গভর্নিং নাউন') ষষ্ঠী রূপ যোগ হয় (আমার বই; ঘরের উপর)। আলোচ্য তঞ্চঙ্গ্যা–তে এই নিয়মগুলি স্থিতিশীল (বিশেষ্য/+অনুসর্গ+এর); তবে গদ্য ভেদে এর উহ্য Null রূপ বা ভিন্নতাও পাই। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি নারী ভাষাতেও ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ ভাষার Famininism এখানে দুর্নীরীক্ষ্য। হ্যাগা, কই গো, ওমা, কসম, আড়ি-শব্দগুলি বাংলায় নারীভাবযুক্ত। তঞ্চঙ্গ্যায় তার ব্যবহার নেই নারীর আলাপিত বা অন্তরঙ্গতামূলক কোনও বাক প্রকাশের ক্ষেত্রে।

উপসংহার ঃ

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা নিয়ে এই আলোচনা একেবারেই প্রাথমিক বিধায় এ ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যার সম্পর্ক সম্পর্কে সামান্য তথ্যই এখানে উপস্থাপিত হল। ভবিষ্যৎ গবেষকগণ এর সমাজগত ভাষিক বৈশিষ্ট্যসহ বিষয়গুলি আরও বিস্তারিত বিবেচনা করবেন আশা করা যায়।

ঃ তথ্যপঞ্জি ঃ

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

১৯৯৫ ঃ তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি। তঞ্চঙ্গ্যা মহা সম্মেলন। ৬ই এপ্রিল বালাঘাটা, বান্দরবান। ৬০ পৃষ্ঠা

যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

১৯৮৩ ঃ 'তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতি' (৩২ – ৩৫ পৃষ্ঠা)/ গিরি নির্ঝর, মার্চ সংখ্যা / উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

১৯৮৫ ঃ তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি/ উজানপাড়া, বান্দরবান। ৫২ পৃষ্ঠা

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

২০০০ ঃ তঞ্চঙ্গ্যা জাতি/বালাঘাটা, বান্দরবান। ১২৪ পৃষ্ঠা।

টীকা ঃ

১ সাধিত/সম্প্রসারিত রূপ, সম্পূরক রূপ, বিবৃতরূপ, বিভক্তি ও বিভক্তিবর্গ সহ Inflexionএর রূপতাত্ত্বিক গঠন প্রভৃতি এখানে স্থানাভাবে উল্লিখিত হল না।

—

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি

– সঞ্জীব দ্রং

১.

কেমন আছেন বান্দরবানের টাইগার পাড়ার তঞ্চঙ্গ্যারা-আজ বহুদিন পর জানতে ইচ্ছে করে? বছর পাঁচেক আগে এক সন্ধ্যাবেলা আমি ওদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট তঞ্চঙ্গ্যা শিশুদের খালি গা দেখে মনে কষ্ট হয়েছিল। তখন শীতকাল ছিল, সন্ধ্যার কুয়াশা ছিল ওদের গ্রামে। কিন্তু ওদের অনেকের শরীরে যথেষ্ট কাপড় ছিল না। বিলো কুমার তঞ্চঙ্গ্যার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাঁকে দেখলে এখন হয়তো চিনে নিতেও পারবো না। তিনি বলেছিলেন, এই টাইগারপাড়ায় ওদের গ্রাম ছিল না। ১৯৭৯ সালে সেনাবাহিনী ওদেরকে জমি দেবে বলে এখানে নিয়ে আসে। এর আগে ওদরে গ্রাম ছিল রোয়াংছড়ির তারাছায়। তাঁর ভাষায় ওখানে 'জুম করে' জীবন চলে যেত। সেখানে লাকড়ি ছিল জঙ্গলে, বাঁশ বেত ইত্যাদি ছিল। টাইগারপাড়ায় এসে ওদের জীবন কঠিন হয়ে গেছে। জুমের জমি চলে গেছে, বদলে গেছে জীবনধারা। বিলো কুমার তঞ্চঙ্গ্যারা এখন রাস্তা থেকে চাল 'কুলি' করেন, ঠিকাদারের পাথর তুলে দেন পাহাড়ের নীচ থেকে, ট্রাকে মালপত্র উঠিয়ে দেন, লাকড়ি টানেন, আবার কদাচিৎ জঙ্গলে যান বাঁশ-বেতের খোঁজে। জুমের জন্য জমি বরাদ্দ কমে গেছে অথবা কারো কারো জমিই নেই। আমি মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করি, রোয়াংছড়িতে কি তঞ্চঙ্গ্যারা ভালো ছিলেন? ওদের কি যথেষ্ট জুমচাষের জমি ছিল সেখানে? জুমে কি ফসল ভালো হতো? সেখানে কি নিরাপত্তা ছিল মেয়েদের? তঞ্চঙ্গ্যা জননীরা কি তাদের সন্তানদের গল্প বলতেন সেখানে? বনের গল্প, পাহাড়ের গল্প, ফুল-পাখী-রূপকথার গল্প? সেটেলার বাঙালি বসতি কি ছিল তারাছায় রোয়াংছড়িতে? তঞ্চঙ্গ্যা জুমিয়া মেয়েরা কি জুমে যেতেন উদ্বিগ্নহীন? ওদের মেয়েদের অপমান কি ছিল না সেনাদের হাতে, সেটেলারদের হাতে? পাহাড়ের কোলে নিজভূমে ওরা কি দু'বেলা খেয়েপড়ে বেঁচেছিলেন? তবে ওরা চলে এলেন কেন টাইগারপাড়ায় আর্মির কথায়? আমি ভাবি, আর্মি কত শক্তিশালী বান্দরবানে, পাহাড়িদের কাছে? ওরা এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে পাহাড়ের মানুষকে কত সহজে টেনে নিয়ে যায়? কত সহজে বদলে দেয় পাহাড়িদের জীবনচিত্র? উপড়ে ফেলে দেয় পূর্বপুরুষের ভূমি ও শেকড়?

সেদিন সন্ধ্যায় আমি দেখেছিলাম ওদের জন্য সরকারের কোনো সাহায্য নেই উল্লেখ করার মতো। আর্মি ওদের বসিয়েছে এখানে (কে কাকে বসায়-প্রশ্ন করি?), কিন্তু জীবনধারনের উপকরণ দেয়নি। ওদের জন্য স্কুল কোথায়, শিশুদের জন্য, মায়েদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কোথায়, বেঁচে থাকার অবলম্বন কোথায়? ওদের পাড়ার নীচ দিয়ে পাকা সড়ক চলে যায়, শহরে-নগরে গাড়ি চলে যায়, কিন্তু ওদের জীবনে সে পরিবর্তনের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে না। আমি মহশ্বেতা দেবীর টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা উপন্যাসে আদিবাসীদের বিষয়ে লিখেছিলেন, ওদের সাহায্য দিতে হলে ওদের জায়গায় গিয়েই দিতে হবে। ওরা কোথায় যাবে না ওদের জায়গা ছেড়ে। এই পাথর, পাহাড়, গুহা ও নদী ছেড়ে যাবে না কোথাও। কোনো শস্যসম্ভবা কৃষিক্ষেত্রে, কোনো সমতলে, যেখানে জল অফুরান, বাঁচার সাহারা অনেক। ও সব জমি তো ছিল ওদরে পূর্বপুরুষদের। ওদের জায়গা ওদের ফেরত দেবার কথা ছিল, কাদের দিল?

বান্দরবানে পাহাড়িদের জায়গা জমি বেসুমার দখল হয়ে গেল। মাইলকে মাইল জায়গা ওদের চলে গেল। আর্মি, বনবিভাগ, সরকার রাস্তা ও বাজারের জন্য ওদের জায়গা ছেড়ে দিতে হলো। সদর জায়গাগুলো, বাজারের জায়গাগুলো, ভালো জমিগুলো তো পাহাড়িদের নয়। ওরা চলে গেলে দূর প্রত্যন্ত পাহাড়ে যেখানে জীবন খুব কষ্টের, যেখান থেকে বাজার বহু দূরে, যেখানে পথ নেই, ওষুধ হাসপাতাল দুর্গম যেখান থেকে। তারাছা থেকে এই তঞ্চঙ্গ্যারা কেন এলেন এখানে টাইগারপাড়ায়? কোন সাহায্যের আশায়? উন্নত জীবনের আশায়? মহাশ্বেতা দেবী আরও লিখেছিলেন, পাহাড় তো ওরা ছাড়বে না। খেতে পাক না পাক, ওটাই ওদের বিলুপ্ত প্রায় জাতিসত্তার প্রতীক। অথচ ওই জমির ফলনশীলতা খুব কম। সেচ, সার ও সময়ে বীজ পেলে বড় জোর চারমাসের খাবার উঠবে।

আমিও মাঝে মাঝে চিন্তা করি, কেন আদিবাসীরা পাহাড় জঙ্গলে ওদের ঘরবসতি গড়ে তোলে? এর উত্তর আমি জানি না। এটা বোধহয় ওই বম জাতির গল্পের মতো। বঞ্চনার গল্প, সৃষ্টিকর্তাও ওদের ঠকিয়েছিলেন, সরলতা ও সততার পুরস্কার হিসেবে। ওদেরকে কঠিন ও পাথরভরা জমি দিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা। সেই থেকে বঞ্চনার শেষ নেই।

২.

আবার আধুনিক ও সুশিক্ষিত তঞ্চঙ্গ্যাদের আমি দেখেছি যারা শহরে থাকেন। ওদের উন্নত ধরনের সংগীত আমি শুনেছি রাঙ্গামাটিতে। নৃত্যও দেখেছি চমৎকার পরিচ্ছদ সজ্জিত। ওদের জুম নাচকে ওরা আধুনিক ফর্ম দিয়েছেন, গতি দিয়েছেন। ক্যাসেট বাজিয়ে তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীরা সে জুম নৃত্য করেন। ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। তবে লাইভ মিউজিক সরঞ্জাম বাজিয়ে গান ও নৃত্য করার পক্ষপাতি আমি। যদিও কাজটি কঠিন ও ব্যয়বহুল। ক্যাসেট বাজিয়ে নৃত্য করাটাই সহজ। তবুও আমাদের মূলটা ফিরে পেতে হবে। পাহাড়ের শিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যার শিল্পকর্ম দেখেছি, তার প্রতিষ্ঠান দেখেছি। তিনি আমাকে তাঁর লেখা বই উপহার দিয়েছেন। বইটির নাম তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। 'জাতি' কথাটা লক্ষ্য করার মতো। পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভিন্ন জাতি হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টা অবশ্য অনেক আগে থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি। এই স্বীকৃতি কে কাকে দিল, সেটা বড় বিষয় নয়। তঞ্চঙ্গ্যা নিজেরা যদি নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করতে চান, তারা নিজেরা যদি নিজেদের ভিন্ন জাতি বলে মনে করেন, সেটাই বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তবে এ কথাটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে যে, আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবেই কাজ করতে হবে নিজেদের মুক্তির জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যায় ছোট ছোট জাতিদের ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্য শাসকশ্রেণী ও স্বার্থান্বেষী মহলের চেষ্টা আছে। এদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

৩.

সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা একদিন আমার বাসায় এসেছিলেন। তিনি রীতিমত সংগ্রাম করছেন বন ও ভূমি রক্ষার জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে হাজার হাজার একর জমি পাহাড়িদের কাছ থেকে নিয়ে ফেলার যে কথা হচ্ছে, যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করেছে সরকার, সেখানে তঞ্চঙ্গ্যাদেরও বিশাল আবাসভূমি ও শস্যভূমি চলে যাবে বেদখলে। ভূমি ও বনরক্ষার যে কমিটি হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, ওদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম আমি রাঙ্গামাটিতে। তাতে আমার মনে হয়েছে, আমাদের পাহাড়িদের মূল লড়াইটা করতে হবে একযোগে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ প্রশাসন পাহাড়িদের নিয়ন্ত্রণে নেই, চুক্তি হয়েও ওদের হাতে ক্ষমতা নেই, ইচ্ছামতো সরকার আগের মতো সবকিছু করে যাচ্ছে পাহাড়ে, ওদের জায়গাজমি সরকার 'নিজের' বলে নোটিশ জারী করছে, আইন করছে, এসবের বিরুদ্ধে লড়াইটা করতে হবে একযোগে, সম্মিলিতভাবে। তবে সরকার আদিবাসীদের একযোগে সম্মিলিতভাবে দেখতে চায় না। আদিবাসীরা যত ভাঙবে, বিভক্ত হবে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করবে, তত সরকারের লাভ। সরকার এটাই চায়, অনেক বাঙালি এটা চায়, আমরা যেন এটা বুঝতে চেষ্টা করি।

৪.

গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে কক্সবাজারের উখিয়ার ভয়াবহ ঘটনার কথা কি আমাদের মনে আছে? ওই মামলার কী অবস্থা এখন? এডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা বেশ কিছু কাগজ পাঠিয়েছিলেন আমাকে। পত্রিকায় খবর অবশ্যই বেরিয়েছিল যে, আক্রান্তরা চাকমা জাতির লোক। কিন্তু পরে জেনেছিলাম ওরা চাকমা নয়, তঞ্চঙ্গ্যা। ওই মন্দিরের জায়গাটির এখন অবস্থা কী? তঞ্চঙ্গ্যারা কি এখন ওই জমি দখলে রাখতে পেরেছে? হত্যা মামলার খবর কী? আদিবাসী যাদেরকে হত্যা মামলার মিথ্যা আসামী করা হয়েছিল, ওরা কি জামিনে মুক্তি পেয়েছে? মামলা কি চলছে তার নিয়মে? ওদিকে চ্যানিও চামকা ও ক্যাজাইঅং চাকমা যে মামলাগুলো করেছিলেন ওদের উপরে হামলার, আক্রমণের নারী নির্যাতনের, সম্পদ লুণ্ঠনের, সে মামলার খবর কী? যে ৮ জন পাহাড়িকে পুলিশ উল্টো ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের সংবাদ কী? আমি অসহায়ের মতো এ প্রশ্নগুলো করছি। এ দেশে কবে কোনকালে আদিবাসীরা ন্যায় বিচার পেয়েছিল? মংক্যছিং রোয়াজা উখিয়া উপজেলার ১ নং জালিয়া পালং ইউনিয়নের মাদারবুনিয়া গ্রামের আদিবাসীদের পক্ষে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন ওদের রক্ষার জন্য। বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ, মানবাধিকার সংগঠনসহ, অনেক মন্ত্রীসহ বহুজনের কাছে কপি দিয়েছেন তিনি সে আবেদনের। প্রধানমন্ত্রী কি এই পাহাড়ি মানুষের কান্না শুনছিলেন? ওদের জিম্মি জীবনের কি অবসান হয়েছে? .... আমি পত্রিকায় দিনের পর দিন এই পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক বর্বরতার খবর পড়ছিলাম। আমরা নিজেরা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি, আমি নিজে ওদের নিয়ে কোনো লাইন লিখতে পারিনি, ওদের অনুরোধ সত্ত্বেও ওদের বিপন্ন জীবন দেখতে যেতে পারিনি। ...

এরকমই তো আমাদের পাহাড়িদের জীবন স্বাধীন দেশে নিজভূমে। সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতা লিখেছেন, পরে যেটা গান হয়ে গিয়েছিল, 'এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম, অবাক পৃথিবী সেলাম, সেলাম তোমাকে সেলাম।' গানটি লিখেছিলেন বৃটিশ শাসকদের লক্ষ্য করে, আদিবাসীরা তো আজও পরাধীন এ দেশে।

৫.

আবার ফিরে যাই মহাশ্বেতা দেবীর কথায়। তিনি বলেছিলেন, 'ভালোবাসা, প্রচন্ড নিদারুণ, বিস্ফোরক ভালোবাসা পারে ওদের এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোনো সংবাহন বিন্দু তৈরি করিনি আমরা। অনাবিষ্কৃত রেখেই ধীরে, সভ্যতার নামে, ধ্বংস করেছি এক মহাদেশ। নো কম্যুনিকেশন গড়তে হলে যে অসম্ভব ভালোবাসাতে হয় বহুকাল ধরে। কয়েকহাজার বছর ধরে আমরা ওদের ভালোবাসিনি, সম্মান করিনি। এখন সময় কোথায় শতাব্দীর শেষ সময়ে? সমান্তরাল পথ, ওদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবী আলাদা, ওদের সঙ্গেও কোন আদান-প্রদান হয়নি, যা আমাদের সমৃদ্ধ করতো।'

৬.

রাঙ্গামটির এ্যানি ও রিনী তঞ্চঙ্গ্যা নামের কিশোরী দুই মেয়ের কণ্ঠে প্রথম তঞ্চঙ্গ্যা গান শুনেছিলাম কোনো এক উৎসবে। গানের কথাগুলো মনে নেই, সুরটাও আর মনে নেই, কিন্তু পাহাড়, পাথর, নদী, অরণ্য, জুমক্ষেত, মাচাংঘর, জীবনের গল্পকে যেরকম ভালোবাসি, পাহাড়ি মানুষকে যেরকম ভালোবাসি, তাদের সংগ্রামকে, বাঁচার স্বপ্নকে যেরকম ভালোবাসি, ওদের গান শোনেও তঞ্চঙ্গ্যা জাতির প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি সেরকম টান অনুভব করেছি। অথচ ওদের সম্পর্কে, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না। বাবু রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা ও বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা অনেকবারই বলেছেন আমাকে নিয়ে যাবেন তঞ্চঙ্গ্যাদের পাড়ায়, পাহাড়ের কোলে, রাজস্থলী বা বিলাইছড়িতে। নীরবে যাবার কথা ছিল। কোনোদিন কি আমি যেতে পারবো ওদের গ্রামে, রাত কাটাবো মাচাংয়ের কোলে? কিভাবে ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে ওদের পাড়ায় দেখতে পারবো? মাচাংয়ের ঘরে বসে ওদের গান, হারিয়ে যাওয়া গল্প শুনতে পাবো? আমার কথা কি জানেন জুমে যাওয়া, স্কুল-কলেজে যাওয়া তঞ্চঙ্গ্যা যুবক-যুবতী? ওরা হয়তো জানে না। দূর থেকে, গারো পাহাড়ের কোর থেকে একজন সামান্য লেখক ওদের সংস্কৃতিকে কত ভালোবাসে, স্বপ্নকে ভালোবাসে, ওদের মঙ্গল কামনা করে, নিরাপত্ত কামনা করি? আমি জানি না।

আমিও একমত, প্রচন্ড ভালোবাসা, নিদারুণ ও বিস্ফোরক ভালোবাসাই কেবল এখন পাহাড়িদের মুক্তি দিতে পারে। আদিবাসী মহাদেশকে রক্ষা করতে পারে। তার আগে, সম্মিলিতভাবে নিজেদের মুক্তির জন্য কাজ করা চাই। সংখ্যায় ছোট হলেও তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সে মুক্তির আকাংখায় সামিল হবেন–এ আশা করি।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা

– সালাম আজাদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারটি জাতিসত্ত্বার মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কথা বাংলাদেশের মানুষের যতটা জানার কথা, যতটা জানা কর্তব্য তা জানে না। এটা বাংলাদেশের প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে ১২টি গছা। সে ১২টি গছার মধ্যে বাংলাদেশে সাতটি গছার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সাতটি গছাগুলো– দৈন্যাগছা, মোগছা, কারবয়া গছা, মংলা গছা, মেলং গছা, লাং গছা এবং অঙ্যা গছা। এগুলোর রয়েছে আরো অসংখ্য উপবিভাগ। এই সাতটি গছার সামাজিক আচরণে পার্থক্য নেই। পুরুষেরা নিজস্ব তৈরি কাবোই শার্ট ও ধুতি বা গামছা ব্যবহার করে থাকে। তবে মেয়েদের পরনের পিনুইন ও খাদির নক্সার সামান্য তারতম্যের কারণে বুঝা যায় কে কোন গছার লোক। তাছাড়া ভাষা ও শব্দ ব্যবহারেও তঞ্চঙ্গ্যাদের বারটি গছার মধ্যে সামান্য হলেও পার্থক্য রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমসম্পর্ক কিংবা নিঃ সম্পর্কীয়, পাত্র পাত্রীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে। ভাই ও বোনের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। স্ত্রী বিয়োগের পর স্ত্রীর যে কোন সম্পর্কের বোনকে বিয়ে করা যায়। ভ্রাতৃবধুর (বউদি) ছোট বোনকে বিয়ে করা যায়। স্ত্রীর বড় কিংবা ছোট ভাইয়ের বউ তালাক প্রাপ্ত হলে তাকে বিয়ে করা যায়। যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না তাদের মধ্যে রয়েছে সহোদর ভাই-বোন, বাবার ভাইদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। একই পিতার ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছেলে মেয়েদের মধ্যে। অসম সম্পর্কের মধ্যে, মামা- ভাগ্নী, ভাইঝি, মাসী- ভাগ্নে, পিসী-ভাইপো এবং নিজের আপন চাচাতো, মাসতুতো, জ্যেঠতুতো বড় বোনকে বিয়ে করা যায় না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে পারে। এছাড়াও অন্য যে সব কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে স্বামী কিংবা স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হলে, স্বামী কিংবা স্ত্রী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে স্ত্রীকে অথবা উৎপীড়ন বা নির্যাতন করলে, পুত্র বধুর প্রতি শশুর-শ্বাশুড়ী উৎপীড়ন বা দুর্ব্যবহার করলে, কোন স্বামী গৃহী জীবন পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করলে, স্বামীর দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হলে বা নিরুদ্দেশ হলে–এরকম নানাবিধ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে।

উপরে যে তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীদের পরিবারিক জীবন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো তারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশের বহু আদিবাসী উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় ধর্ম বদল করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় না। যারা ধর্ম বদল করেছে সে সব আদিবাসী মানুষেরা কতটা উন্নত জীবন পেয়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তঞ্চঙ্গ্যারা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম অক্ষুন্ন রেখেও অনেকে উচ্চ শিক্ষিত হয়েছেন।

তঞ্চঙ্গ্যাদের বসত বাড়ির বৈচিত্র হচ্ছে তারা উচু মাচাং ঘরে বাস করে। জেইত ঘর, ভাতঘর এবং টংঘর এরকম তিনটি ঘরের সমন্বয়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের পারিবারিক জীবন গড়ে উঠে। তারা বিশ্বাস করে অন্যকথায় তাদের মধ্যে সংস্কার প্রচলিত রয়েছে– সোমবার -শুক্রবার ধান রোপন করা শুভ এবং মঙ্গল ও বুধবার ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করা শুভ। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান যাকে তারা কিচিং বলে সেখানে ঘর বানায় না। তারা আরো বিশ্বাস করে ছড়া বা ঝিড়ির শেষ প্রান্তে, পরিত্যক্ত ধর্মীয় স্থানে, শ্মশানের ওপর, উঁই ভিটার ওপর, বাবা জেঠা কাকা বড় ভাইয়ের সম্মুখে ঘর নির্মান করলে অমঙ্গল ডেকে আনে, তবে বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের অপ-সংস্কৃতিকে লালন-পালন প্রায় করছেনা।বিভিন্ন কৌশলে তঞ্চঙ্গ্যারা ছড়া বা ছোট নদীতে মাছ শিকার করে থাকে। 'দুব' নামে বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি এক প্রকার খাচার সাহায্যে বিভিন্ন রকমের মাছ, বিশেষ করে চিংড়ি ও কাকড়া শিকার করে থাকে। 'কবামেল' নামক এক প্রকার জংলী গাছের শিকড় পিষে ছড়ার ওপর ঢেলে দিলে ছড়ার সমস্ত মাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং সহজেই সে সব নিস্তেজ মাছ তারা ধরে ফেলে। তঞ্চঙ্গ্যাদের পশুপাখি শিকার করার প্রথা প্রাচীনকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তীর ধনুক এবং জালের সাহায্যেই তারা সাধারণত পশু পাখি শিকার করে থাকে। আর গৃহপালিত কুকুরের সাহায্যে হরিণ, বন্য শুকর, বন্য মুরগী ইত্যাদি শিকার করে থাকে। তাদের মধ্যে গরুর মাংস খাওয়া নিষেধ আছে।

ষাট কিংবা সত্তর দশকের যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল, আজ তা পাল্টে গেছে। বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর আমলে সরকার ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পূর্নবাসনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে সেটেলারদের

নেওয়া হয়েছে তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন মহলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সেটেলারদের নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে যে চা বাগান করার কথা সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে যদি তা করা হয় তা হবে পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। চা বাগান করার অজুহাতে এবং সে সব বাগানে কাজ করার কথা বলে হাজার হাজার সেটেলারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নেওয়া হবে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ হয়ে পড়বে প্রান্তিক বা মার্জিনাল। আর সেটেলাররা হবে সংখ্যা গরিষ্ঠ। ভোটের হিসাবের সময় সেটেলাররা সংখ্যা গরিষ্ঠ হলে যা হবার তাই হবে। ক্ষমতা বর্তমানে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা আর জুম্ম জনগণের হাতে থাকবে না। সেটেলাররা হয়ে যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের দন্তমুন্ডের মালিক। আর তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারটি জাতিসত্তা নিজেদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। সেই প্রেক্ষাপটে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মতো একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থা কি পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

শুধু তঞ্চঙ্গ্যা জাতির অস্থিত্বই নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বকীয়তা, এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা, যারা জুম্ম জনগণ নামে সমধিক পরিচিত তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য, এই অঞ্চলকে জুম্ম জনগণের বাসোপযোগী রাখার দায়িত্ব শুধু মাত্র পাহাড়ি মানুষের একার নয়। এদেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য এবং তা বাংলাদেশের বৃহৎ কল্যাণেই করা প্রয়োজন।

সালাম আজাদ ঃ লেখক ও মানবাধিকার কর্মী

তঞ্চঙ্গ্যা, তন্‌চংগ্যা নাকি তংচঙ্গ্যা?

– শ্রী বীর কুমার তংচঙ্গ্যা

দীর্ঘদিন ব্যাপী ব্যবহৃত "তঞ্চঙ্গ্যা" শব্দটি ইদানীং বিভিন্ন জনে স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী নামের শেষে ব্যবহার করছেন। যেমন, কেহ লিখছেন শ্রী রূপায়ন তন্‌চংগ্যা, কেহ লিখছেন শ্রী অজিত তঞ্চঙ্গ্যা, আবার কেহ লিখছেন শ্রী বোধিসত্ব তংচঙ্গ্যা। কিন্তু একটি পদবী (Title) এভাবে ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিখা বা ব্যবহার করার কোন অর্থ আছে কি?

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর আর কোন জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের পদবী এরকম ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিখেন বলে আমার জানা নেই। আমি মনে করি, তঞ্চঙ্গ্যাদের (প্রচলিত বানানটাই আমার এই প্রবন্ধে ব্যবহার করলাম) স্বীয় জাতি সত্ত্বা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই এই রকম হচ্ছে, স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী পদবীর নামটি বানান করছেন।

চাক্‌মারা শাক্যজাতির বংশধর হওয়ায় ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মায়ানমার) বা আরাকানে তাদেরকে শাক বা শাকমাং নামে অভিহিত করা হয়। এই শাক বা শাকমাং থেকেই বর্তমান "চাকমা" নাম বা শব্দের উৎপত্তি। এই কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং চাকমারা ও এই "চাকমা" শব্দটিই নিজের পদবী বা জাতিগত পদবী বলে নামের শেষে ব্যবহার করছেন। তাদের কোনজন বিভ্রান্তিতে পরে "চাংমা" "চাংমাং" বা "চাকমাং" বানান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করছেন না।

আমাদের ব্যবহৃত তঞ্চঙ্গ্যা শব্দটির বানানগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাক। ত + ঞ + চ + ঙ + গ্যা = তঞ্চঙ্গ্যা, – ত + ন্‌ + চ + ং + গ্যা = তন্‌চংগ্যা, – এ দুটির উচ্চারণ একই। কেবল বানানে যুক্ত অক্ষর বর্জন করা হয়েছে। আর ত+ ং + চ + ঙ + গ্যা = তংচঙগ্যা বা তংচঙ্গ্যা এই দুটোর উচ্চারণও একই রকম।

কোন জাতি গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির পদবীতেই বোঝা যায় সেই জাতিগোষ্ঠী বা ব্যক্তির ইতিবৃত্ত অর্থাৎ মূল উৎপত্তির ইতিহাস। যেমন, চাকমাদের পদবী (চাকমা) থেকে আঁচ করা যায় চাকমারা শাক্যজাতি থেকে উদ্ভূত। ত্রিপুরাদের পদবী (ত্রিপুরা) থেকে আঁচ করা যায়– তারা ত্রিপুরা জাতির নরগোষ্ঠী।

আমার এ প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে এই যাবত বহুলভাবে ব্যবহৃত "তঞ্চঙ্গ্যা" শব্দটি ব্যবহার করছি তবে আমার পদবী আমি "তংচঙ্গ্যা" (এই বানান পদ্ধতি অনুসরণ করে) প্রচলন করার পক্ষপাতি।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, চাকমা জাতি প্রাচীন শাক্যজাতির বংশধর। তঞ্চঙ্গ্যাগণ, চাকমা জাতির একটি শাখা বা অঙ্গ। কালের পরিক্রমায় শাক্যজাতির নাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদিগকে শাক্যজাতির শেষ বংশধর বলা হয়ে থাকলেও, হয়ত আরো অনেক জনগোষ্ঠী অন্যকোন নামে, শাক্যজাতির শেষ বংশধর রূপে এখনো বিদ্যমান আছেন যাদের আমরা চিনিনা বা জানিনা।

স্বর্গতঃ মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মী তাঁর শ্রী শ্রী রাজনামা বা "চাকমা রাজন্য বর্গ" নামক পুস্তকে চাকমারা দুটো অংশে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুটো অংশের মধ্যে "রোয়াঙ্গা চাকমা" বা "টং চঙ্গ্যা চাকমা", অপরটি "আনক্যা চাকমা"। একদা আরাকানকে বলা হত "রোয়াঙ্গ" এবং চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে বলা হত "আনক"। চাকমাদের মধ্যে যারা রোয়াঙ্গে বসবাস করতেন, তাদেরকে বলা হত "রোয়াঙ্গা" আর আনকে যারা বসবাস করতেন তাদেরকে বলা হত "আনক্যা চাকমা"। স্বর্গতঃ শ্রীমাধব চন্দ্র চাকমা কর্মীর এই উক্তিতে আমরা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্পর্কে এই ধারণা লাভ করি যে, চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যা একটি অভিন্ন জাতিসত্ত্বা। সূত্রঃ তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি, যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা- বান্দরবানঃ ১৯৮৫ সাল। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা এক অভিন্ন জাতির লোক বলে, চাকমা জাতির ইতিহাস প্রনেতা গণের অপরাপর জনের বক্তব্যে (সিদ্ধান্ত) ও হুবহু একই রকম পরিদৃষ্ট হয়।

চাকমা জাতির একাংশের নাম কেন তঞ্চঙ্গ্যা হল, তার মূলে দুটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতটি হল এইরূপঃ

(এক) কথিত আছে, আরাকানে বসবাসকারী চাকমাগণ যাদের আরাকানী লোকেরা দৈংনাক নামে আখ্যায়িত করেন। স্বজাতি চাকমাদের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্য তাদের কিয়দংশ আরাকান ত্যাগ করেন। আনক বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে তারা প্রথমে মাতামুহুরী নদী অববাহিকায় 'আলে-কঅ- দ্যায়ং' স্থানের কাছাকাছি তৈনছড়ি নামক এক উপনদীতে বসতি স্থাপন করেন। বিশিষ্ট চাকমা সমাজকর্মী, 'চাকমা দর্পন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা প্রয়াত যামিনী রঞ্জন চাকমার মতে এই আলে-কঅ-দ্যায়ং শব্দটি মারমা শব্দ। এককালে এই স্থানের একটি পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত ছিল, এবং সেখানে শতশত কবুতর বাস করত বলে জনশ্রুতি আছে। সেই কারণে ইহার নাম আলে কঅ-দ্যায়ং (আলে-অর্থ মধ্যবর্তী স্থান, কঅ অর্থ কবুতর এবং দ্যায়ং অর্থ বাসা– পুরোপুরি অর্থ মধ্যবর্তী স্থানের কবুতরের বাসা)। বর্তমানে সেই নামটি রূপান্তরিত হয়ে আলি কদম এ পরিণত হয়েছে।

তৈনছড়ি মাতামুহুরী নদীর একটি উল্লেখযোগ্য উপনদী। সেখানে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর ক্রমে ক্রমে মাতামুহুরী অববাহিকা ধরে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে কিছু চলে যায় দক্ষিণ দিকে নাক্ষ্যংছড়ি, কক্সবাজার, উখিয়া ও টেকনাফ। আবার আরাকানের ভুসিটং, মংডু থেকে অনেকে সোজা নাফ নদী পার হয়ে উখিয়া, টেকনাফ ও কক্সবাজার আগমন করেন। বৃহদাংশ পশ্চিমে সাপ্রেকুলের দিকে কর্ণফুলি নদী ও শঙ্খ নদীর মোহনার মধ্যবর্তী ধ্যাং পাহাড় এলাকায় যায় ধ্যাং পাহাড় থেকে মুল চাদিগাং অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন। রোয়াঙ্গ বা আরাকান থেকে আগত দৈংনাকেরা দীর্ঘকাল ধরে এইসব এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। কথিত আছে, দৈংনাকেরা চট্টগ্রাম শহরে তৎকালে পর্তুগীজ বণিকদের নিকট থেকে লালকুঠি নামক একটি মনোরম কুঠি বাড়ি ক্রয় করে স্বজাতির রাজা মহারাজ ধরমবক্স খাঁকে উপহার প্রদান করেন। ঐ কুঠি বাড়ি পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার বাংলো করা হয়। তখন চাকমা জাতি চট্টগ্রাম শহরের পূর্ব দিকে, কর্ণফুলি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ধীরে -ধীরে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে রাউজান, রাঙ্গুনীয়া অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্য অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়েন। তাদের অনুসরণ করে দৈংনাকেরা রাউজান, রাঙ্গুনীয়া অতিক্রম করে কিয়দংশ রস্যাবিলে ছড়িয়ে পড়েন, অবশিষ্টাংশ চন্দ্রঘোনায় এসে কর্ণফুলির নদী অববাহিকা ধরে উজানে অগ্রসর হন + ওয়াগ্‌গা এবং রামপাহাড় সীতা পাহাড়ে থিতু হয়ে যান। কিছুকাল পর দৈংনাকদের মধ্যে বিখ্যাত তেরজন ব্যক্তি ধরমবক্স খাঁ মহারাজের সহিত সাক্ষাত করে এতদ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তালুক ও তালুক নামা লাভের আবেদন জ্ঞাপন করেন। তখন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত বার তালুকের বারজন আহ্ভু (দলপতি) এবং একজন মাত্র রায়ত (প্রজা) ছিলেন। মহারাজ ধরম বক্স খাঁ তাদের এই পদ মর্যাদা সূচক পরিচয় পেয়ে তাদের কর্তৃক তালুকনামার দাবী সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যায় পতিত হন। রায়ত (প্রজা) ছাড়া তালুক হতে পারেনা। তাঁদের তের জনের দলে রয়েছেন বারজন আহ্ভু এবং রায়ত মাত্র একজন। কাজেই বারজন আহ্ভুর জন্য মাত্র একজন রায়ত হলে কিভাবে তাদেরকে তালুকনামা প্রদান করা যায়? তাই মহারাজ ধরম বক্স খাঁ তাদেরকে পরার্মশ দিলেন, বারজন আহ্ভু যদি রায়ত হতে পারেন,

তবে একজনকে তালুকনামা প্রদান করবেন। কে রায়ত, কে আঙু হবেন তা এখনই তাদের ঠিক করতে হবে। অগত্যা বারজন আঙু তাঁদের সঙ্গী রায়তকে আঙু (দলপতি) মেনে নিয়ে তাঁর নামে তালুক নামা প্রদানের আবেদন জানালেন। এই বারজন আঙুর (দলপতির) গোত্র বা দলের নামানুসারে দৈংনাকদের বারগছা (গঝার) উদ্ভব হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে- (১) কারবুয়া গছা, (২) মোঅ গছা, (৩) ধন্যা গছা, (৪) মংলা গছা, (৫) লাং গছা, (৬) মেলংগছা, (৭) তাস্‌সি গছা, (৮) লাপস্যা গছা, (৯) তামলুক গছা, (১০) রাঙী গছা, (১১) আঙু গছা এবং (১২) অঙ্যাগছা। অঙ্য গছা সম্পর্কে দ্বিমত দেখা যায়। সাধারণত ঃ উপজাতীয় অপর জনগোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে যদি তঞ্চঙ্গ্যাদের দলভুক্ত বা গোত্রভুক্ত হতে চায় - তাকে সাদরে গোত্রে গ্রহণ করা হয় এবং তাকে অঙ্য বা অন্যগছার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত বারজন অঙুর মধ্যে হয়ত এরকম অন্য বা অপর জাতিসত্তার লেখক দৈংনাকদের গোত্র ভুক্ত হয়ে আঙুর পদ পেয়ে থাকতে পারেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে (১) কাররয়া গছা, (২) মোঅ গছা, (৩) ধন্যা গছা, (৪) মংলাগছা, (৫) লাংগছা, (৬) মেলংগছা, (৭) আঙু গছা ও (৮) অঙ্যাগছার লোকই দেখা যায়।

দৈংনাকেরা প্রথমে কর্ণফুলি নদীর উভয় তীরবর্তী রামপাহাড় ও সীতাপাহাড়ে বসতি স্থাপন করে সেখান থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়েন। মহারাজ ধরমবক্স খাঁ রাজ সরকারে জুম তৌজি প্রস্তুত করার সময় নবাগত দৈংনাক দিগকে চাকমা নামে তৌজিভুক্ত করা হয়নি। রোয়াঙ্গ থেকে প্রথম আনকে আগমন করে মাতামুহুরী নদীর আলে কঅ দ্যয়ং অঞ্চলে তৈন গাঙে বসবাস করার কারণে তৈনগাঙ্যা বা তৈনছর্‌য্যা (তৈনগাঙ বা তৈনছড়ির বসবাসকারী হিসাবে) নামে জুম তৌজিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই তৈন গাঙ্যা বা তৈন ছর্‌য্যা নামের ক্রম বিবর্তিত নামই তঞ্চঙ্গ্যা রূপে পরিচিত হচ্ছে।

এইটি হল প্রথম সম্ভাব্য মত। দ্বিতীয় মতটি হল এইরূপ ঃ দৈংনাকেরা আরকান ত্যাগ করে আনক বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে প্রথমে মাতামুহুরী নদীর আলে কঅ দ্যয়ং এর তৈনছড়ি উপনদীর অববাহিকায় সর্ব প্রথম বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে প্রবন্ধের প্রথমে উল্লিখিত পরিক্রমা অনুসারে তাঁরা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হন। চাকমা রাজ সরকারে জুম তৌজিতে তাঁদের বা দৈংনাক না লিখে 'তংচাকমা' নামে তালিকাভুক্ত করা হয়। মারমাদের কথায় দক্ষিণ দিগকে "তং" বলা হয়। পশ্চিম দিককে 'আনক' এবং উত্তর দিগকে বলা হয় 'ম্রং দং'। সেজন্য ত্রিপুরাদের মারমারা বা আরাকানীরা বলেন ম্রোং বা ম্রো। আর দৈংনাক বা দক্ষিণের চাকমা দিগকে বলে "তংচাক"। পশ্চিম বা চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা দিগকে বলেন "আনক চাক"। রাজ সরকারে তঞ্চঙ্গ্যাদের যেই নামে তৌজিভুক্ত করা হয় তা হচ্ছে "তংচাকমা"। সেই নামটি ক্রমে ক্রমে তংচংগ্যাতে রূপ লাভ করে।

এখন যারা তঞ্চঙ্গ্যা বা তন্‌চংগ্যা লেখেন তাঁরা প্রচলিত প্রথম মতটির অনুসরণে অর্থাৎ তৈনছয্যা মনে করেই নামের শেষে তন্‌চংগ্যা লেখেন। আর তংচাঙ্গ্যা যারা লেখেন তারা "তং চাকমা" শব্দটির বা "দক্ষিণের চাকমা" অনুসরণ করেই নামের শেষে তনচংঙ্গ্যা বা তংচঙ্গ্যা লেখেন।

এখন বুঝতে হবে কোন্ বানানটি গ্রহণযোগ্য। তৈন ছয্যা (তঞ্চঙ্গ্যা, তন্‌চংগ্যা) বলতে তৈনছড়ির অধিবাসী (এককালীন) কেই বোঝায়। তবে যেকোন ব্যক্তি বা জাতি গোষ্ঠীর লোক তৈনছড়িতে বসবাস করলেই তাকে অনায়াসে তৈনছয্যা আখ্যা দেওয়া যায়। ইহাতে তার জাতি বা গোষ্ঠীগত পরিচয় নির্দিষ্ট হচ্ছে না। সেই জাতি বা ব্যক্তি মারমা হতে পারে, দৈংনাক হতে পারে কিংবা চাকমা হতে পারে। কাজেই আমার মতে তঞ্চঙ্গ্যা বা তন্‌চংগ্যাদের গোষ্ঠীগত পরিচিতি এতে নির্দিষ্টভাবে আদৌ পাওয়া যাচ্ছেনা।

তংচাকমা বা তংচঙ্গ্যা শব্দ দ্বারা বুঝা যায় তারা চাকমা তবে "তং" অর্থে দক্ষিণের চাকমা। ইহাতে তাদের গোষ্ঠী বা জাতিগত পরিচিতি অনায়াসেই বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং তংচঙ্গ্যা শব্দটিই তন্‌চংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যার চাইতে তাদের (তঞ্চঙ্গ্যাদের) গোষ্ঠীগত বা জাতিগত পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট করছে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সম্পর্কিত অভিমত

– শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

বিশ্বের প্রত্যেক জাতি, বর্ণ, গোত্র ও তাদের বৈচিত্র ধারায় রয়েছে স্বকীয় সংস্কৃতি। একই ধর্মাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পালন করতে দেখা যায় ধর্মীয় আচরণাদি। বর্তমান বিজ্ঞান যুগে বিশ্বের কাঁচা মাংস খাওয়া, পশু আরাধনা এমন কি নগ্ন জীবন যাপন এমন সংস্কৃতি হামেসা দেখা যায় টেলিভিশনের পর্দায়। শত সহস্র বছর আগে ওসব মানুষের কি আচরণ ছিলো তা ভাবতে অবাক লাগে। সভ্য ভারতে মানুষ বধ করে নরযজ্ঞ, সতীদাহ এমন অদ্ভুদ কাহিনী কে না জানে। মাত্র একশত বছর আগে এ পার্বত্য অঞ্চলে মিজিলিক(কাপালিক) নামধারী নরঘাতক বিচরণ করতো। খেতাবধারী বা প্রভাবশালী লোকেরা নারীর উপর যথেচ্ছা যৌন কর্মে লিপ্ত থাকতো। বাঙালী সমাজেরও মহিলারা বিয়ের ব্যাপারে আদিবাসী সভ্যতা যে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, 'মহুয়া' পালাটি দেখলে প্রমাণিত করা যায়।

তংচঙ্গ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা নামের উচ্চারিত শব্দটির অর্থ কি এবং তাদের আগমন, জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন লেখকরা বিভিন্ন মন্তব্য করে আসছেন। ক্যাপ্টেন টি, এইচ লুইনের ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর লিখিত তথ্য মতে, 'টং-থা' অর্থাৎ তঞ্চঙ্গ্যা জাতিরা ত্রিপুরা, মারমা ও তাদের গোষ্ঠী অন্তর্গত। এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে। টং অর্থ পাহাড় বা দক্ষিণ, থা (tsa) অর্থ সন্তান বা চাকমা। পাহাড়ী জাতিদের চিহ্নিত করার জন্য এসব জাতির নাম কেবল আরাকানী উপভাষী উপজাতিরাই এভাবে ব্যবহার করে।

পণ্ডিত শ্রী গগন চন্দ্র বড়ুয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব প্রথম ইতিহাস প্রণেতা শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৮৮-১৯২৯) কর্তৃক রচিত চাকমা জাতির ইতিহাস (১৯০৯) বিবরণে জানা যায়, তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমাদের অভিন্ন সংস্কৃতি, মূলত ঃ একই জাতি। রাজা বিজয়গিরি চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল জয়ের পর সসৈন্য সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় পথে শুনতে পেলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়গিরি পিতৃ সিংহাসনে স্বঘোষিত রাজা হয়ে তাঁকে স্বদেশে ফেরার পথে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সংবাদে রাজা বিজয়গিরি খুবই মর্মাহত হন এবং অনুজের দুরভিসন্ধি ও বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি স্বদেশে স্বজাতির মুখ দর্শন না করতে পেরে পুনঃ অধিকৃত রোয়াং (আরাকান) ফিরে যান। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী বসবাস, রাজ্য শাসন এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য সৈন্যগণ অনেকেই ভিন্ন জাতীয়, রমণী বিয়ে করেন। রাজা বিজয়গিরি শেষ বয়সে ভিক্ষুত্ব জীবন ধারণ করেন। বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা নামের এ জাতিরা সেই পূর্ব পুরুষের বংশধর হিসেবে গণ্য করা যায়।

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈন সুরেশ্বরী নামে দক্ষিণাঞ্চলে ঐ বংশেরই রাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে তৈনছড়ি নামে ছোট নদীটি নাম হয়। ত্রিপুরাদের ভাষায় 'তৈ' অর্থ জল বা নদী। রাজা সুরেশ্বরী ত্রিপুরা জাতি তা শ্রী মাধবচন্দ্র চাকমা তাঁর শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমার ইতিহাস নামক পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর মতে চাকমারা দুটি অংশে বিভক্ত। একটি রোয়াংগ্যা চাকমা ও অপরটি আনক্যা চাকমা। তঞ্চঙ্গ্যারা রোয়াংগ্যা চাকমা হিসেবে গণ্য করা হলেও ত্রিপুরাদের মধ্যে এখনও রোয়াংগ্যা ত্রিপুরা রয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যা রমনীর পরিধানে পিনুইন আর ত্রিপুরা রমনীর পরিধানের গিনাই এখনও মিল রয়েছে। শ্রী মাধব চন্দ্র চাকমা মহাশয়ের পুস্তকে বর্ণিত তথ্য মূলে আরাকানের চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা), দৈনাক ও তঞ্চঙ্গ্যা অভিন্ন এবং একই চাকমা জাতি। শ্রী শ্রী রাজনামা-(পৃঃ ৩০)

পূর্ববর্তী ইতিহাসকে সংশোধন করে ১৯৬৭ ইং সনে বাবু বিরাজমোহন দেওয়ান কর্তৃক তথ্য বহুল একটি 'চাকমা জাতির ইতিহাস' নামে পুস্তক প্রণয়ন করেন। চাকমা ও আরাকানীদের সাথে বারবার সংঘর্ষে, বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক স্থান পরিবর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতি উদ্ভবের কারণে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝপথে জাতির ভাঙ্গন শুরু হয়। তার পরিণতি ফলে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। উক্ত সময়ে রাজা অরুণ যুগ ১০,০০০ হাজার সৈন্য সহ (ঢাল ধারণকারী যোদ্ধা) বার্মারাজ মেংদির নিকট পরাজিত হয়ে বন্দী হন। মগের ভাষায় দৈ অর্থে ঢাল এবং নাক্ অর্থে যোদ্ধা। এই দৈনাক শব্দটি মূলতঃ তঞ্চঙ্গ্যাদের পৃথক পরিচিতি করলে উভয় সম্প্রদায় এক এবং চাকমা জাতি। রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার বার্মা (মায়নমার) এমনকি ভারতের লুসাই হিল, আসাম ও ত্রিপুরায় বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি পার্থক্য নেই। এমনকি চাকমাদের সাথে তঞ্চঙ্গ্যা পূজা পাঠন, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আচরনাদি তেমন পার্থক্য নেই।

উপজাতিয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট রাঙামাটি এর প্রাক্তন পরিচালক শ্রী অশোক কুমার দেওয়ানের উক্তি মতে, এক সময় মগজাতিরা তংসো এবং আনক্‌সা নামের একই সম্প্রদায়কে দুটি নামে অভিহিত করতেন। তিনি এটা উল্লেখ করেন, ষোল শতকের আগে চাকমা নামে এ শব্দটি ছিলো কিনা বোধগম্য নহেন। ইতিহাস বিদ্‌দের মতে, চাকমা সর্দার (রাজা) ধাবানা ছিলেন মোঘলের আনুগত্য ও ইসলাম ভাবাপন্ন। তিনি দক্ষিণ অঞ্চলের বসবাসরত দৈনাক, চাপ্রে বা তংসো নামের লোকদেরকে ছাঁৎ করে চাকমা নামের পৃথক একটি জাতি সংস্কার গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে ধরম বক্স খাঁ শাসনামলে এ জাতিকে (তঞ্চঙ্গ্যা প্রজাদেরকে) তৌজি নিবন্ধনে নাম বাদ দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইনের মতে উক্ত সময়ে ৪,০০০ হাজার তঞ্চঙ্গ্যা এ জেলায় আগমন করেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের স্বজাতি দাবীর আবেদন রাজা প্রত্যাখান করেন এবং উক্ত সময়ে বহু তঞ্চঙ্গ্যা পুনঃ দক্ষিণাভিমুখে চলে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমান বার্মা, বাংলাদেশ ও ভারতে তঞ্চঙ্গ্যা জনসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ।

এ প্রসংগে বলা যায়, বুর্‌বো গোঝা নামের লোক চাকমা জাতির বহু রয়েছে। এরা মূলতঃ তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ধৈন্যাগছা ও মো গছার একটি অংশ। বুর্‌বো গোঝার নেতা ও বন্দুক ভাঙ্গা ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীধর্মমোহন কার্বারী নিজকে তঞ্চঙ্গ্যা বলতে গর্ববোধ করতেন। তাঁর উক্তি মতে, তাঁর ঠাকুরদা তঞ্চঙ্গ্যাদের দৈন্যাগোঝার ভাষায় কথা বলতেন। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে প্রত্যাগত তাদের দলটি রাজা ধরমবক্স খাঁ এর নিকট বিনীত আনুগত্য স্বীকার করেন এবং শর্ত মোতাবেক রাজা তাঁর খাসমৌজায় জুমকর মুক্ত প্রজা হিসাবে বসতি স্থাপনে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, - পরপ্তী অর্থাৎ বহিরাগত বা বাইরের দল বা গোত্র হিসাবে 'বাউর্‌গোয়া' গোঝা নামে তাদেরকে সম্বোধন করা হতো এবং পরবর্তীতে বাউর্‌গো থেকে বুর্‌গো গোঝা নামে পরিচিতি হন। বর্তমানে তাঁরা সবাই চাকমা, শিক্ষায় অনেক উন্নত।

Tribal Culture in Bangladesh এবং 'আরণ্য জনপদে' দুটি গ্রন্থ প্রণেতা জনাব আব্দুস সাত্তার। তিনি তাঁর পুস্তকে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মাইচ ছড়ি মৌজা, বড়াদম মৌজা ও চেংগী মৌজায় গিয়ে সেখানকার চাকমাদের সাথে আলাপ করেন। ঝগড়া বিল মৌজার চিত্র বৈদ্য, দেবেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এবং ডি, সি অফিসের অফিস সহকারী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যার পরিবেশিত তথ্য সহায়তায় পূজা পার্বণ, গোঝা বা গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। তিনি তঞ্চঙ্গ্যাজাতি সম্পর্কে যে কয়েকটি তথ্য উত্থাপন করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১। তঞ্চঙ্গ্যারা পুরাপুরি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী নয়, মুসলমানের একটি অংশ।
২। তঞ্চঙ্গ্যারা নিষ্ঠুর প্রকৃতি। জীবনের প্রতি মায়া নেই।
৩। অভিবাদন করার রীতি তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে অনুপস্থিত।
৪। পূজা পার্বণে তঞ্চঙ্গ্যাগণ পশু পাখি বধ করে উৎসর্গীয় পশুর মাংস দেবতার উদ্দেশ্য অরণ্য অভ্যন্তরে রেখে আসে।
৫। মদ ছাড়া তঞ্চঙ্গ্যাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান হয়না।
৬। তঞ্চঙ্গ্যারা মামাতো বোন ছাড়া কাউকে বিবাহ করতে পারেনা।
৭। সাধারণতঃ তঞ্চঙ্গ্যাদের বিবাহের সময় ছেলের বয়সের তুলনায় মেয়ের বয়স বেশী হয়।
৮। বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ ছেলেকে দা অস্ত্রশস্ত্র বল্লম ইত্যাদি যৌতুক স্বরূপ দান করে থাকে। ছেলেকে অবশ্যই এক হাজার ডিম প্রদান করতে হয়। এক হাজার ডিম না হলে তঞ্চঙ্গ্যাদের বিবাহ হয়না।
৯। তঞ্চঙ্গ্যারা মৃত ব্যক্তির লাশ দাহ করার পর নৃত্য গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জুম ক্ষেতে সেই ভষ্মীভূত ছাই পুঁতে রাখে। এরা সংস্কার মুক্ত নয়।
১০। বান্দরবান জেলার তঞ্চঙ্গ্যা এবং রাঙামাটি জেলার তঞ্চঙ্গ্যাদের অনেক ব্যাপারে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
১১। চাকমারা তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে।

আব্দুস সাত্তার সাহেবের পুস্তক থেকে একই ভাবে অনুকরণ করে মংচ উ চৌধুরী 'তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি' নামে ভ্রান্ত বাক্যগুলো সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় (১২ই নভেম্বর, ১৯৭৮ ইং) প্রচারিত করেন। একটি জাতির প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপন ও সম্ভ্রমহানীর জন্য একই পত্রিকায় ২২শে জুলাই, ১৯৭৯ ইং শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা তীব্র প্রতিবাদ করেন।

জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেব তাঁর "Tribal Culture in bangladesh" ও "আরণ্য জনপদে" (১ম সংস্করণ, ১৯৬৬ খৃঃ)

গ্রন্থে চাকমা জাতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অযৌক্তিক ছবি এবং ভুল তথ্য বর্ণিত করেছেন। ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং উক্ত গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে। অনুষ্ঠানে চাকমা শ্রী সলিল রায় তাঁর নাতিদীর্ঘ পঠিত বক্তব্যে ভুল প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হয়। বইঃ দ্বাদশবর্ষ ১২শ সংখ্যা ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ৬৭-ক, পুরাণ পল্টন ঢাকা-২, বাংলাদেশ।

আমার কথা হলো, সাত্তার সাহেব "Tribal Cultuure in Bangladesh" ও "আরণ্য জনপদে" পুস্তকে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তার জন্য প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু উনি তো আমাদের নিজের লোক নন। তাই ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে। উনি লিখেছেন, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি মাইচ ছড়ি, বড়াদম, চেংগী গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। আদতে উনি বানিয়ে লিখেছিলেন। কেননা ওখানে কোন তঞ্চঙ্গ্যা কোন কালে ছিলোনা। এমনকি অনেকেই তঞ্চঙ্গ্যা জাতি দেখেননি ওসব স্থানে। বৃটিশ শাসনামল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন দেশী বিদেশী লেখক তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে নিয়ে এমন উত্থাপন করতে দেখা যায়নি। এ বই বিভিন্ন কলেজ, ইউনির্ভাসিটিতে পড়ানো হবে, বিদেশে মর্যাদা পাবে। সাত্তার সাহেবের উল্লিখিত পুস্তক পুনঃ ছাপা হলে উল্লিখিত ভুল তথ্যাদি সংশোধন করার অনুরোধ রইল।

(রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা)
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ
রাঙামাটি চারুককলা একাডেমী

প্রসঙ্গ ঃ তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি

– নন্দলাল শর্মা
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা সাহিত্য, স.বৃ.ক. (হবিগঞ্জ)

১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যার গ্রন্থ 'তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিত'। তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন উদযাপন কমিটি গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। মহাসম্মেলনের আহবায়ক এবং বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য শ্রীপ্রসন্নকান্তি তঞ্চঙ্গ্যার আর্থিক সহায়াতায় গ্রন্থটি প্রকাশিত। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যপূর্ণ বসতগৃহ, দিনের কর্মসমাপনান্তে গৃহমুখী নরনারী ও পানির পাতিল এবং কলসীসহ তঞ্চঙ্গ্যা রমনী। প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করেছেন শিল্পী শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা। ইতিহাসের কোন শুভলগ্নে যারা দৈংনাক নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই দৈংনাক নামধারী জনগণ এবং কালক্রমে তঞ্চঙ্গ্যা নামে বিকশিত হয়ে এসেছেন। ভাবীকালে অমৃতসম্ভবা সেই তঞ্চঙ্গ্যা জনগণের হাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে।

গ্রন্থের লেখক শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা পার্বত্য অঞ্চলের একজন প্রবীণ সাহিত্যসেবী। তিনি প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটিকা, কবিতা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমান দক্ষতায় বিচরণ করছেন। বাংলা ও চাকমা উভয় ভাষায় তিনি লিখেন। ইতঃপূর্বে চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা 'লোকায়ত দর্শন' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে জন্মগ্রহণকারী একজন কৃতী পুরুষ। তাই তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধ, অধীত ও অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে তিনি একখানা বৃহদাকার গ্রন্থ প্রণয়নের দক্ষতা রাখেন। সম্মেলন উপলক্ষে তিনি বিষয়টি নিয়ে ষাটপৃষ্ঠার একটি পরিচিতি পুস্তিকা রচনা করেছেন। বিন্দুর মধ্যেও সিন্ধুর আমেজ এই হিরন্ময় পুস্তিকায় পাওয়া যায়, যা পাঠকদের তৃপ্তি দান করতে সক্ষম।

গ্রন্থের ভূমিকায় 'প্রাক কথন' শিরোনামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে লেখক বেশ কিছু মূল্যবান কথা লিখেছেন। তিনি জানিয়েছেন বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী উপজাতি এই তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফে বসবাস করছে। তাদের সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিক। এছাড়া মায়ানমার, ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল এবং মনিপুরেও তঞ্চঙ্গ্যাদের বসতি আছে। এই জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর দলভুক্ত। তবে তাদের ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত পালি-প্রাকৃত সম্ভূত বাংলা ভাষা। পার্বত্য

চট্টগ্রামে বসবাসরত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাগণ চতুর্থস্থানের অধিকারী।

চাকমাজাতির ইতিহাস রচয়িতাগণ তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমাজাতির একটি শাখা হিসেবে অভিহিত করেছেন। চাকমাগণও তাদের মূল চাকমা বলে স্বীকার করেন। কিন্তু ইতিহাসে বর্ণিত দৈংনাক, তৈনটংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যাগণ আদৌ চাকমা জাতির অংশ কিনা তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। চাকমাও তঞ্চঙ্গ্যাদের ধর্ম বৌদ্ধ, নৃতাত্ত্বিকভাবে তারা মঙ্গোলীয়। ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতিতে প্রচুর মিল থাকায় বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা প্রভৃতিতে বেশ কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। প্রধান পার্থক্য চাকমাদের ছেচল্লিশটি বংশাবলী বা গোঝার মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাদের বারটি গোঝা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যার দৃঢ় প্রত্যয়। "তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্য, পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার আবাস গৃহের বৈশিষ্ট্যতা (যদিও বর্তমানে আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ বৈশিষ্ট্য অনুসরণের সুযোগ নেই) সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠান চাকমাদের ঐ সকল বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ ধারণ করেছে। কাজেই তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমাকে দুই পৃথক জাতিসত্ত্বা বলে খুব সহজেই চেনা যায়।"

'দৈংনাক- তৈনটংগ্যা – তঞ্চঙ্গ্যা' অধ্যায়ে লেখক উল্লেখ করেছেন আদি নিবাস আরাকানে এই জনগোষ্ঠী দৈংনাক নামে পরিচিত। শব্দটির আরকানি অর্থ যোদ্ধা। এই জনগোষ্ঠীর এক অংশ ক্রমে মাতামুহুরি ও অপর শাখা তৈনছড়িতে বসতি স্থাপন করে। তৈনছড়ি থেকে তারা রাঙ্গামাটির দিকে আসে। তৈনছড়ি থেকে আগত বলে চাকমা রাজ সরকারের জুম তৌজিতে এরা তৈনটংগ্যা নামে তৌজিভুক্ত হয়। তৈনটংগ্যা শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে তঞ্চঙ্গ্যা শব্দে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের মন্তব্য আলোচিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমাজাতি' গ্রন্থে তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তির যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটি উদ্ধৃত করে লেখক চাক উপজাতির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে মংমং চাক-এর উদ্ধৃতি সংকলন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন "নামগুলি বা স্থান সমূহের বানানে এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য ব্যতীত উভয় কাহিনীই অবিকল এক।" প্রসঙ্গক্রমে লেখক অশোক কুমার দেওয়ানের বিচার বিশ্লেষণও উল্লেখ করেছেন। অশোক কুমার দেওয়ান Sir Arther Phayre- এর প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন। ফেইরির মতে দৈংনাকেরা দাসরূপে আনীত বাঙালিদের উত্তর পুরুষ। দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনে দৈহিক গঠন, আকৃতি ও চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাগণ আসলে আরাকান থেকে আগত পৃথক একটি জনগোষ্ঠী বলেই লেখক তঞ্চঙ্গ্যাদের পরিচিতি করিয়ে দিয়েছেন। তার বিশ্লেষণ– "তঞ্চঙ্গ্যাদের ইতিহাস কোন রাজবংশ বা দলনেতার ইতিহাস নহে। তাদের ইতিহাস তাদের সাধারণ জন মানুষেরই ইতিহাস। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অভিযান অগ্রগতি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির খতিয়ান নহে, তা সমগ্র তঞ্চঙ্গ্যা জাতির অভিযান অগ্রগতি ও সাফল্যের খতিয়ান"। যথার্থই যুক্তিগ্রাহ্য ও আধুনিক মনস্কতার পরিচায়ক।

তৃতীয় অধ্যায় 'দৈংনাকের নবজন্ম ঃ ভাগ্যের সন্তান তঞ্চঙ্গ্যাগণ' – এ লেখক বাংলাদেশের থেরবাদী বৌদ্ধধর্মেই নবজাগরণে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির, যিনি বার্মায় ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে অংশ গ্রহণ করেন, –এর অবদান তুলে ধরেছেন। কেবল বৌদ্ধধর্মের বিকাশে নয়, শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভূমিকা লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এবং পার্বত্যজেলা পরিষদে পদের জন্য আসন (রাঙ্গামাটিতে দুটি, বান্দরবানে একটি) সংরক্ষণের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

'গোঝা ও গুত্থি' অধ্যায়ে লেখক তঞ্চঙ্গ্যাদের ছয়টি গোঝা ও বিভিন্ন গুত্তির নাম উল্লেখ করেছেন। 'ভাষা' অধ্যায়ে তিনি তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার শব্দাবলীকে আর্য, অনার্য এবং বিদেশী –এই তিনভাগে বিভক্ত করে উদাহরণ দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আছে তঞ্চঙ্গ্যাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের বর্ণনা। এ তিনটি অধ্যায় অতিসংক্ষিপ্ত বলে পাঠকের অতৃপ্তি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তী দুটি অধ্যায় মূলত আলোচনা নয়–তালিকা। এগুলো হচ্ছে (১) তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কে কোন বিষয়ে সর্বপ্রথম এবং বর্তমানে স্নাতকোত্তর ও টেকনিক্যাল শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা।

সামাজিক অনুষ্ঠান অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ পদ্ধতি। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রচলিত তিন রীতির বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে লেখক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। সমাজে প্রচলিত বৈধ

ও অবৈধ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ের লেখক নানাদিক তুলে ধরেছেন। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথাও লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের সমাজে শবদাহ বা অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া পদ্ধতিও লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন। তঞ্চঙ্গ্যাজনগণ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী হলেও তাদের মধ্যে বেশ কিছু কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। লেখক এ জাতীয় সাতটি পূজার–গাঙপূজা, ভূতপূজা, ছুমুলাঙ পূজা, মিত্তিলি পূজা, লক্ষীপূজা, কে পূজা ও বুরপারা–সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষে তাদের আচরিত বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন। এ অধ্যায়টি আলোচনা শেষ করা হয়েছে তঞ্চঙ্গ্যাদের বাদ্যযন্ত্র – বাঁশি, বেলা প্রভৃতি – এবং সংগীতের পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের জীবনচর্যার পরিচিতি দানের পর বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা 'পরিশিষ্ট' অংশে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। "দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যাগণ সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেও চাকমা বা অপর কোন জনগোষ্ঠীর বা জাতির সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। তাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তাদেরকে বরাবরই পৃথক করে রেখেছে।"

গ্রন্থে কয়েকটা চিত্র সংযোজিত হয়েছে। যেমন– তঞ্চঙ্গ্যাদের অলংকার রাখার ঝুড়ি ও আদি অলংকার, স্বকীয় পোষাক, অলংকারসজ্জিতা তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী, তঞ্চঙ্গ্যা আলাম (ডিজাইন ক্লথ), তত্ত্ব বয়নরত তঞ্চঙ্গ্যা রমনী, নৃত্যরত তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী এবং গৃহমুখী তঞ্চঙ্গ্যা রমনী। চিত্রগুলো গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা যদি তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি বৃহদায়তন গ্রন্থ বঙ্গভাষীদের উপহার দেন তাহলে আমাদের সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে একটি মাইলফলক সংযোজিত হবে। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকব।

আহ্বান

– শ্রীমতি পারমিতা তঞ্চঙ্গ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারটি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি একটি। তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্য, ভাষা, কৃষ্টি অন্যান্য জাতিসত্ত্বা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। অন্যান্য জাতিসত্ত্বার মত তঞ্চঙ্গ্যাদেরও রয়েছে রূপ কথা, প্রবাদ প্রবচন, উপদেশ মূলক গল্প। যে গুলো মূলত ঃ তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে পচ্ছুন নামেই সর্বাধিক প্রচলিত।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কোন লোককে যদি উপকার করতে গিয়েও ভাল কিছু না হয়ে খারাপ কিছু হয়ে যায় তবে নিম্নোক্ত গল্পটির উপমা দেওয়া হয়ে থাকে। গল্পটি শুরু করা যাক –

<u>**নিতিঙ্গ্যার পচ্ছুন**</u>

সে অনেক দিন আগের কথা। নিতিঙ্গ্যা নামে এক তঞ্চঙ্গ্যা লোক ছিল। সে ছিল ভীষন আলসে। তাই স্বভাবতঃ সে ছিল অত্যন্ত গরীব। সামর্থ বলতে তার কিছুই ছিল না। "দিনে আনি দিনে খাই" এ অবস্থা। বড়ই কষ্টে সে দিনাতিপাত করত। তার এ দূরাবস্থা দেখে মা লক্ষীর মন কেঁদে উঠল। ভাবলেন নিতিঙ্গ্যার জন্য কিছু একটা করতে হবে। যাতে সে সুখে দিনাতিপাত করতে পারে। এ মনোভাব নিয়ে মালক্ষী একদিন রূপবতী নারী সেজে নিতিঙ্গ্যার কাছে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এক রাতের জন্য। নিতিঙ্গ্যা গরীব হলেও মনটা ভাল ছিল। তাই আনন্দে রাজী হল আশ্রয় দিতে।

রাতে নিতিঙ্গ্যা ও মালক্ষী ঘুমিয়ে পড়লেন মাচাং ঘরে। মালক্ষী নিতিঙ্গ্যার অলক্ষ্যে নিজের চুলের সাথে নিতিঙ্গ্যার চুলের গিট্ দিলেন। [তখনকার দিনে নারী পুরুষের চুলে একত্রে গিট্ পড়লে বিয়ে হয়ে যেতো] সকালে ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে নিতিঙ্গ্যা দেখে আশ্রিতা নারীর চুলের সাথে তার চুল গিট্ লেগে গেছে। নিতিঙ্গ্যা চুল ছড়ানোর চেষ্টা করলে মালক্ষী বললেন "খোদার ইচ্ছেয় তোমার আমার অলক্ষ্যে দু'জনের সাঙা (বিয়ে) হয়ে গেল"। এভাবে মালক্ষীর সাথে নিতিঙ্গ্যার সংসার শুরু হল।

অত্যন্ত পরিশ্রম করে মালক্ষী ও নিতিঙ্গ্যা একটা জুম কেটে ধান রোপন করল। একদিন মালক্ষী জুমে গিয়ে দেখলেন সমস্ত জুমে আগাছা। মালক্ষী আগাছাগুলো তুলে জুমের এককোণে নিয়ে একটা পাথরচাপা দিলেন। সমস্ত জুম সাফ হয়ে গেল।

নিতিঙ্যা একদিন জুম দেখতে গেল। জুমে বেড়াবার সময় হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন কাঁদছে কুঁ্যা কুঁ্যা। নিতিঙ্যা অবাক হয়ে শুনে আর ভাবে জুমে কে কাঁদে। এমনি ভাবতে ভাবতে পৌছল আগাছা চাপা দেওয়া পাথরটার কাছে। পাথরটা উল্টিয়ে দেখে আগাছাগুলো কাঁদছে। সে তৎক্ষণাৎ পাথরটা সরিয়ে দিল। আবার সমস্ত জুম আগাছায় ভরে গেল।

বাড়ীতে এসে নিতিঙ্যা স্ত্রীকে সব খুলে বলল। মালক্ষী শুনে বললেন, একি করেছো তুমি? আগাছা পরিষ্কার করে আমি পাথর চাপা দিলাম আর তুমি পাথরটা সরিয়ে দিলে! মালক্ষী তড়িঘড়ি জুমে গিয়ে আগাছাগুলোকে পুনরায় পাথর চাপা দিয়ে আসলেন। নিতিঙ্যাকে বার বার সাবধান করে দিলেন যেন পাথরটা না সরায়। জুমটা আবার সাফ হয়ে গেল।

মালক্ষীর স্পর্শে নিতিঙ্যার জুম ধানে ধানে ভরে গেল। এই মাত্র যে পাকাধান কাটল কিছুক্ষণ পর সেগুলোই আবার পাকা ধানে পরিণত হয়ে যায়। যার ফলে নিতিঙ্যা ধান কেটে কূল পাচ্ছেনা। ধান কাটা আর ফুরাই না। এদিকে বিষুও [চৈত্র সংক্রান্তি/বৈসাবী] এসে গেল। গ্রামের লোকেরা সবাই দলে দলে বিষু উৎসবে চিৎমরম নয়তো মহামুনী মেলায় যাচ্ছে। যাওয়ার সময় চিৎকার দিয়ে নিতিঙ্যাকে ডাক দিয়ে বলছে, ওরে নিতিঙ্যা, বিষুর উৎসবে যাবে না? নিতিঙ্যাও গলা উঁচু করে বলে ধান কাটা না ফুরালে কেমনে যাবো? এদিকে ধান তো কাটলেও আবার নতুন ধান গজাচ্ছে।"

সবাই বিষুর উৎসবে যাচ্ছে অথচ নিতিঙ্যা যেতে পারছেনা। তাই তার ভীষণ রাগ হলো ধানগুলোর উপর। তাই একদিন রেগে মেগে সে"চাড়িটা" [কাস্তে] দিয়ে দিল এক বাড়ি [[চাবকানো]] ধান ছড়াগুলোর উপর। গজ গজ করতে করতে বাড়ীতে এসে দেখে বউ তার জ্বরে কুই কুই করছে। রাগের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। নিতিঙ্যা রাগত স্বরে বলল, আবার জ্বর বাঁধালে? বৌ বলে, "তুমিইতো মেরেছো আমাকে। মারে চোটে একেবারে জ্বর।" নিতিঙ্যা অবাক হয়ে বলল, কখন মারলাম? বৌর কাছে গিয়ে দেখে সারা শরীরে চাড়ির আঘাতের চিহ্ন। নিতিঙ্যা ভীষণ অবাক হয়। মালক্ষী তখন বিস্তারিত খুলে বলেন। আরও বলেন, নিতিঙ্যা যে ধানে আঘাত করেছে তা মালক্ষীর শরীরে লেগেছে। কারণ সে আঘাত প্রাপ্ত ধান মালক্ষী স্বয়ং। মালক্ষী বললেন। "তোমাকে ভাল করতে চাইলাম অথচ তুমি আমাকে রাখতে পারলে না।" মালক্ষী চলে গেলেন। নিতিঙ্যা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তখন থেকে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কারও ভাল করতে গিয়ে ভাল না হলে বলা হতো–

"নিতিঙ্যারে গ–অম গুত্য চালুং, গ-অম ন উল।" বলতে গেলে এটা তঞ্চঙ্গ্যা প্রবাদে পরিণত হয়।

এমনি শত শত প্রবাদের জন্ম এমনি ছোট ছোট গল্প থেকে। যেসব গল্প আমাদের সমাজের অনেক অসংগতি, অনেক অমানবিকতা কিংবা অনেক হাস্যকর কিছু তুলে ধরে। যা আমরা ক্রমশঃ ভুলে যেতে বসেছি। অথচ এসব গল্প থেকেই আমরা সমাজের অসংগতি যেমন তেমনি অসংগতি দূরীকরণের উপায় এবং অমানবিকতার পরিবর্তে মানবিকতা বিকাশের উপায়ও খুঁজে নিতে পারি। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষগুলো সভ্যতার ক্রমবিকাশে আধুনিক অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এসব উপদেশ মূলক গল্প হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে। যা কোন জাতির জন্যই সুফল বয়ে আনতে পারে না। ইদানিং কিছু কিছু লেখক (বাঙালী) পার্বত্য চট্টগ্রামের হারিয়ে যাওয়া রূপকথা নিয়ে বই বের করছেন। অথচ সেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের লেখকদেরই করা উচিত ছিল এবং তাঁরাই রূপকথাগুলোর প্রকৃত মর্মার্থ ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হতেন।

ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য; হারাতে বসা নিজেদের ঐতিহ্যমন্ডিত রূপকথা, প্রবাদ প্রবচন, উপদেশ মূলক গল্পগুলো পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার মানসে পার্বত্য চট্টগ্রামের লেখকগণই এগিয়ে আসুক রূপকথা লিখতে – এ আমার আন্তরিক আহ্বান।

পাষাণ পাহাড়

–ঈশ্বরচন্দ্র তনচংগ্যা
সহকারী শিক্ষক, ওয়াগ্‌গা উচ্চবিদ্যালয়।

চৈত্রের খা খা রৌদ্দুর। মাথার উপর সূর্যটা সরাসরি কালচে মাটিটা তে পড়ে আরো উত্তপ্ত করেছে জুমটাকে। কয়েক পা বাড়ালে মনে হয় পায়ে ফোসকা পড়বে। মাথার উপর যে গাছটি আছে তাও জুম পোড়ানোর সময় সবপাতা আগুনে ছেঁকা খেয়ে ঝরে গেছে। পোড়া কাঠের কালিগুলো এখানে ওখানে লেগে সর্বাঙ্গ বিকৃত করে দিয়েছে। মশা মারতে গিয়ে গালে কালো দাগের আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে। অসহ্য পরিশ্রম। ঘামে- কালিতে ছাইয়ে শরীর একাকার। তবু থেমে নেই- ধীরেনের হাত দুটি; ডান হাতে দা এর কোপ বাম হাতে কাটা পোড়া লতা এবং আধপোড়া কাঠগুলো নিচের দিকে ছুড়ে ফেলা – অনবরত চলছে সকাল হতে এ কাজ। সামান্য পেছনে একই কাজে ব্যস্ত দু'মাস আগে তড়িগড়ি করে ঘরে তুলে আনা নতুন বৌ। প্রচন্ড রৌদ্রে, গরমে ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে- কিছুক্ষণ পর রক্ত ঝরবে। হাতে পায়ে রংধনুরঙ্গা-পেননে কোমর বন্ধনীতে (পাঅধুরী) এ বছর শীতে বানানো সালুমটা (জামা) পোড়া কাঠের কালি, ছাই লেগে অন্যরকম হয়ে গেছে যেন কতযুগের পুরনো পোষাক। অসহনীয় গরম, অক্লান্ত পরিশ্রম – কপালের রেখাগুলো গভীর হতে গভীরতর করে দেয়। মাঝে মাঝে একেবারেই অসহ্য মনে হয়। তখন আধপোড়া আধকাটা গাছের গোড়ার নিচে সামান্য ছায়াতে বসে জিরোতে হয়। তারপরও গরমটা একটু ও কমেনা। আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পোড়া গাছের গোড়া গুলোতে বসে কেঁ কেঁ শব্দে ডাকে রৌদ্দুর পোকা। এরা রৌদ্রটাকে যেন আরো প্রখর ও গরম করে দেয়। জুমের চারপাশে কয়েকটি বড় বড় গাছ এখনো সবুজ পাতাসহ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এদের নিচের ঝোপঝাড়, ছোটখাট গাছ গাছড়া সব পুড়ে গেছে। ঐ গাছগুলোতে বসে কত রকমের পাখি ডাকছে। পাখিগুলোর রং ও হরেক রকমের। দুরে কোন গাছে বসে ডাকছে খু-উ-দ খু-উ-দ করে ধান খুচা পাখি। পাখিটা ধানখুচার (বপনের) তাগিদ দিচ্ছে। দুই তিন দিনের মধ্যে আরাকাচা (জুমে পোড়া আধপোড়া খড়খুটো, লতা পাতা কাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার করা) শেষ করতে হবে– ধীরেন আর তার স্ত্রী হিসাব কষে। ছোট ভাইটা গেছে একা একা আদা লাগাতে, আজ শেষ করবে। বুড়ো মা থাকে ঘরে। অনবরত অসুখ-বিসুখ তার, বয়সটা যতোই বাড়ছে ততোই যেন শৈশবে যৌবনে সংসার জীবনে করে আসা কঠোর পরিশ্রমের কষ্টগুলো, ব্যথাগুলো মাথাঝাড়া দিয়ে উঠছে। ছেলে দুটো এং নতুন বৌ এর জন্য ভীষণ চিন্তা হয় বুড়ো মায়ের। ছেলের বাপে খুব তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে কষ্টমুক্ত হয়েছে। নয়টা বছর অনেক কষ্টে, অভাব অনটনের মধ্যে হলেও ছেলে দুটো জুমচাষ করার উপযুক্ত করে তুলেছে। বড় ছেলের জন্য বৌ তুলেছে। তারপরও কিভাবে ওরা সারাটা জীবন পাহাড়ে পাহাড়ে জুম করে জীবন কাটাবে-এ নিয়ে ভাবে। তার ছেলেগুলো শেষ জীবনে এসেও রোগে, ব্যথায় কষ্টে একটুও শান্তি পাবে না! তবুও বুড়ো মা প্রার্থনা করে -এ বছর যেন জুমে ভাল ধান ফলে, ভাল হলুদ হয়। যেন বৌ ছেলে কেউ অভাবে না পড়ে।

সূর্যটা এখন ঠিক মাথার উপর। আওড়াটা শেষ করে ধীরেন আর বৌ ছরায় (ঝর্ণা) নেমে আসে। ঝর্ণার তীরে সবুজ গাছের শীতল ছায়ায় গা জুড়োয়, সুখ দুঃখের কিছু কথা হয়। বৌ গোসলের জন্য প্রস্তুতি নিতে নিতে বলে-"আগামীকাল ছোট ভাইটা আসলে পরশু আড়াকাচাটা শেষ করতে পারবো।"

–'হিসাব করো না তো হিসাবের গরু বাঘে খায়।'

বৌ আর কথা বাড়ায় না। কয়েকটা কলাপাতা কেটে আনতে বলে ঝর্ণার জলে গোসল করতে নেমে পড়ে। শীতল জলে মনপ্রাণ শান্ত হয়। ধুয়ে মুছে যায় শরীরের এখানে ওখানে লেগে যাওয়া কালি, ছাই। কোন আদিম যুগ হতে ফিরে আসে নতুন যৌবন, নতুন রূপ। সূর্যের প্রচণ্ড দহন হতে ফিরে আসে পূরিপূর্ণ যৌবন। সামনে অনেক উঁচু করে দাড়ানো পোড়া জুমটার দিকে তাকিয়ে আর ভাবা যায় না--এ রূপ, এ যৌবনকে।

এরমধ্যে চার পাঁচটা কলাপাতা নিয়ে আনে ধীরেন। পাতাগুলো একটা স্বল্প ছায়ায় নুড়ির উপর রেখে দিয়ে স্ত্রীকে বলে–"কলাপাতাগুলো কি করবে করো, আমি গোসল সেরে নিই।"

–তাড়াতাড়ি করো! খুব ক্ষিধে ধরেছে।" –বলতে বলতে বৌ গভীর ছায়ায় কলাপাতাগুলো বিছিয়ে নেয়। ভোররাতে বানানো কলাপাতায় মোড়ানো ভাত তরকারি গুলো আস্তে আস্তে খুলে ফেলে। ভাত তরকারী গুলো হতে সিদ্ধ কলাপাতার এক ধরনের সুগন্ধ ছড়ায়। এ গন্ধে ক্ষিদের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।

অনেক কথা অনেক গল্প বলতে বলতে দুপুরের খাবারটা শেষ হয়ে যায়। দুপুরের বিশ্রামটা নেয়ার জন্য আরাম দায়ক কোন কিছু নেয়। শক্ত একটা পাথরে কয়েকটা গাছের পাতা দিয়ে বালিশ করে ধীরেন শুয়ে পড়ে। জিড়োবার কথা বললে

বৌ বলে–"রাতে খাবারটা কি তরকারী দিয়ে খাবে?" বলতে বলতে কাল্লাং (ঝুড়ি) আর দা-টা নিয়ে ঢুকে যায় জুমের পাশে পোড়া জঙ্গলে তরকারী খুজতে। কিছুক্ষণ পর এক কাল্লং লতাপাতা নিয়ে ফিরে আসে। ঘামে এক প্রকার গোসল হয়ে গেছে। ধীরেন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে-বৌয়ের দিকে। কি অমানুষিক পরিশ্রম! কষ্টে কপালের গভীরভাবে ভাঁজ পড়ে। এ বিরামহীন শ্রম, কষ্ট থেকে রেহায় পাবার কোন পথ তার চোখে ভাসে না। এ অভাবের ও কষ্টের জীবনটাতে মায়ামমতা, প্রেম মাঝে মাঝে অর্থহীন মনে হয়। তবুও যেন একটু সুখের আশায় জীবনে সবকিছু সয়ে যেতে হয়। কতকাল পেরিয়ে যায়-তবু আশা পূর্ণ হয় না। কোন বারই জুমে ফলানো ধান, কলা, হলুদ দিয়ে সারাটা বছর সুখে স্বাচ্ছন্দে কাটেনি। বিশেষ করে বর্ষাকাল ও ভাদ্রমাসটা খুব টানা পোড়নের মধ্যে কাটে।

তিনদিন পর দেখা গেল-বৌয়ের হিসাবের গরু বাঘে খায়নি। ছোট ভাইসহ তিনজনে দু'দিনে জুমের আড়াকাচাটা শেষ করেছে। কোন কাজ ছাড়া একদিন জিড়োয়। ধীরেন যায় বাজারে। সপ্তাহে একদিন বাজারে গিয়ে একসপ্তাহের চাল ডাল লবণ তেল যা কিছু লাগে কিনে আনতে হয়। পরদিন আবার জুমে যায় ধীরেন, বৌ, ছোট ভাই বীরেন। দু-ভাইয়ে কলা চারা রোপন করে আর বৌ ভূট্টা, সীম, ঝিঙা, পটল, কুমড়া আরো অনেক শাকসবৃজির বীজ লাগায়। জুমে এ শাকসবৃজির বীজগুলো ভালোভাবে জন্মালে বছরে অনেকটা সময় তরিতরকারির সমস্যা হয় না।

কলার চারা গর্তে বসানো শেষ হয় পাঁচ দিনের মাথায়। বিষুর পর হলুদ ও ধান রোপন করা হবে। বৌ চারদিন ধরে জুমে যায়নি। বিষুটা মাত্র আর তিনদিন বাকী। বাড়ির চতুস্পর্শ পরিস্কার করা, ঘর মাসা, কম্বল, বিছানা পত্র ধোয়া-সব সেরে নিয়েছে চারদিনে। জুমে না গেলেও বাড়ির কাজগুলো নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বৌ-কে। তারপরও বিষু উৎসবের প্রস্তুতিটা এক প্রকার শেষ করতে পেরে মনটা ফুরফুরে লাগছে। এই মাত্র রাতের রান্নাটা শেষ করে বসেছে, মাদা খাবং (মাথার বন্ধনী) টা নিয়ে খাবং-এর প্রান্তের সুতাগুলো পাকিয়ে নিচ্ছে। ধীরেন পাড়ায় কোথাও আড্ডা দিতে গেছে। বীরেন তার সুইবার রুমে চুপ করে শুয়ে কি যেন ভাবছে। হয়তো ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবার আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে চোখ বুজে আসে। আবার গা টা নেড়ে সতেজ হতে চেষ্টা করে। এভাবে কয়েক বার করার পর ডাকদিয়ে উঠে– "ভা-বী ঘুম পাচ্ছে, খাবার রেডি করো।" মাদা খাবং টার সুতাগুলো পাকাতে পাকাতে ভাবী সাড়া দেয়–"তোর দাদা কোথায় একটু ডাক দেয়।"

– ডাকতে হবে না। ওর খাবারটা পেতে রেখে দাও।
– অল্প তরকারী যে, একসাথে খেলে ভাল হয়।
–আমি ডাকতে পারবো না। মাকে বলো।
– মা ঘুমিয়েছে।

বীরেন আর কথা বলে না। শরীরটা খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘুমটা খুব বেশী আসতে চাইছে। বিছানা থেকে উঠতে মোটেও ইচ্ছে করছেনা। বৌ মাদা কাবং -এর কয়েকটা সুতা পাকায় কিছু না বলে। এর পর বীরেনকে ডাক দেয়– দাংগু! এ-ই দাংগু!

সাড়া না পেয়ে মাদাকাবংটা একপাশে রেখে সোজা চলে যায় বীরেনের ঘুমোবার রুমে। কলাচারা লাগানোটা শেষ করার জন্য আজ একটু বেশী পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাই বীরেন ক্লান্ত-বুঝতে পারে ভাবী। বীরেনের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকিয়ে ডাকে–"দাংগু! এ-ই দাংগু।"

বীরেন কিছুটা বিরক্ত সুরে সাড়া দেয়–"আ-হা! খাবার খেতে দিলে দাও তো। নয়তো ঘুমুতে দাও।"

– খাবার পাতে তুলতেছি তো! আস! আমরা দু'জনে খেয়ে নিই। রান্না ঘরের দিকে চলে যায় বৌ। বীরেন কিছুক্ষণ পর বিছানা হতে উঠে এসে খেতে বসে। তাদের খাওয়ার সময় ধীরেনও এসে খেতে বসে পড়ে। একসাথে রাতের খাবারটা শেষ করে, নিদ্রা দেবীর কোলে যায় সবাই। অনেক দুঃস্বপ্নে হয়তো শেষ হয় একটি রাত। আজ আগামী কাল বাজারে নেয়ার জন্য কলা, পেঁপে, বাগান হতে আনতে যাবে ধীরেন আর ছোট ভাই। দুদিন পর বিষু। অন্যান্য সপ্তাহ চেয়ে এ সপ্তাহের বেশী টাকার প্রয়োজন। বৌ গেছে অন্য দূর জঙ্গলে লাকরি (জ্বলানি কাঠ) আনতে।

জীবনে কাংখিত সুখকে ইচ্ছে করেও সহজে আনা যায় না এবং আসেও না। কিন্তু অনেক আশা আকাংখা ভেঙ্গে হঠাৎ দুঃখ বিপদগুলো এসে হাজির হয়। কোন মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় কখন উৎ পেতে থাকে ক্ষনিকের জন্যও কেউ টের পায় না। ভোর সকালে সামান্য খাবার খেয়ে নিজের কলাবাগানের দিকে পাহাড় উঠতে থাকে দুই ভাই। ধীরেনের কাঁধে একজোড়া ঝুড়ি-সে পেঁপে নেবে। বীরেনের কাঁধে চারহাতি বাঁশের লাঠি। লাঠির দু'পাশে কলা ঝুলিয়ে নেবে। পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে বিষুর খরচের একটা হিসাব দুই ভাইয়ে করে ফেলে। তারপর ধীরেন ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করে–

তোর ভাবীসহ আমরা বেড়াতে গেলে বিষুটা সামলাতে পারবে না কি তুমি?
– নাস্তাপাস্তা যা কিছু আয়োজন করবো -তৈরি করে দিতে হবে আর কি? আমি শুধু পরিবেশন করবো।
– তাহলে তো বিষুর আগের দিন যাওয়া যাবে না?
– বিষুর দিন সকালবেলা গেলে তো-হয়।
–যাওয়া যায়।

একথা বলার পর পরই দুই ভাই থমকে দাঁড়ায়। পাহাড়ী পথ। চারদিকে ঘোর জঙ্গল। পাশের জঙ্গলে কিছু একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে–হু-উ-স, হু-উ-স।

হুঙ্কারের সাথে সাথেই সামনে এসে দাঁড়ায় একটা মস্ত বড় ভালুক। একেবারে ধীরেনের সামনে। বীরেন পেছনে ছিল। বিপদের মুহূর্ত টের পেয়ে বাঁশের লাঠিটা উঁচু করে ধরে জানোয়ারটাকে আঘাত করার জন্য। কিন্তু তার আগেই জানোয়ারটা ঝাপিয়ে পড়ে ধীরেনের উপর। ধারালো নখ বসিয়ে দেয় একেবারে মুখ মণ্ডলে। ধীরেনের চোখে অন্ধকার নেমে আসে। পালাতে গিয়ে পায়ে লতা জড়িয়ে পড়ে যায় পাশের ঝোপে। জানোয়ারটা সাথে সাথে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। বীরেন এ চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তে সাহস হারায়নি। বাঁশের লাঠিটা দিয়ে ভালুকটাকে আঘাত করতে করতে বাঁশটা ফেটে গেছে। ভালুকটি আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে ধীরেনকে ধারালো নখের আছড়ে, দাঁত দিয়ে খিচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। এক সময় ধীরেনের দেহটা নিথর হয়ে যায়। নড়ছে না টের পেয়ে ভালুকটা আবার হু-উ-ম দিয়ে বীরেনের সামনে তার চেয়ে উঁচু করে দাঁড়ায়। বীরেন পাহাড়ের নিচের দিকে কোন রকমে দৌড়ে পালায়। জানোয়ারটি তাকে কিছুদুর ধাওয়া করে পাশের জঙ্গলে ঢুকে নিশ্চুপ হয়ে যায়। হয়তো অনেক দুরে পালিয়ে গেছে। বীরেন কিছুদুর পালিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। শরীরে এক ধরনের কম্পন ছুটেছে। ভাইয়ের অবস্থা দেখেছে নিজের চোখে। এ-কি দুঃস্বপ্ন! এত বড় বিপদ! কি হবে, কি করবে-অনেক্ষণ ভেবে সমাধান পেল না। অকুলস্থলের দিকে আর ফিরে গিয়ে দাদার অবস্থা দেখবে তাও সাহস পাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে জানোয়ারটা এখনো পথের পাশে লুকিয়ে আছে–তার উপর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হঠাৎ কিভেবে পাহাড়ে এবড়ো থেবড়ো পথ দিয়ে দৌড়ে নামতে থাকে। দৌড়াতে থাকে গ্রামের দিকে। যে পথটি নেমে আসতে এতদিন একঘন্টার চেয়ে বেশী সময় লাগত আজ সে পথটি ৮/১০ মিনিটে অতিক্রম করে গ্রামে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠে – দাদা শেষ! দাদা শেষ। ভালুক! ভালুক! "বলতে বলতে বাঁধভাঙ্গা কান্না নেমে আসে। আর থামতে চায় না। কোন কথাও আর বেরোতে চায় ন– শুধু কান্না। পড়শী একজন সম্পর্কে চাচা- বীরেনকে জড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় শান্তনা দেয়-"শান্ত হও বাবা; শান্ত হও। আমরা এখনই যাচ্ছি।

মুহূর্তে দুঃসংবাদটি গ্রামময় ছড়িয়ে গেল। দশ/পনের জন পাড়া পড়শী দৌড়াতে দৌড়াতে হাপাতে হাপাতে পাহাড়ি পথ উঠে ঘটনাস্থলে পৌছে। এসে দেখতে পায় –ঝোপে ঝোপে, পাতায় পাতায় শুকনো সাদাটে শক্ত পথের মাটিতে রক্ত আর রক্ত। পথের পাশে একটু ঝোপের আড়ালে পড়ে আছে–দুর্ভাগা ধীরেনের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহটা। চোখ দুটো উঠে গেছে, দৈত্য ভালুকটা প্রথমে ধারালো নখ দিয়ে চোখ দুটো তুলে ফেলেছে। মুখে-সর্বাঙ্গে মাংসে ছিড়ে ছিড়ে ঝুলছে। ফর্সা হ্যাণ্ডসাম দেহটা বিভৎসরূপ ধরেছে। সবাই ধরে নিসাড় দেহটা প্রথমে ঝোপ থেকে পথের মাঝখানে তুলে আনে। তারপর সদ্যকাটা দুটি সরু গাছের গুঁড়িতে লতা জড়িয়ে জড়িয়ে ট্রেজার বানিয়ে ফেলে। ট্রেজারের উপর কয়েকটা কলা পাতা দিয়ে তার উপর মৃতদেহটা তুলে দেয়। দুই প্রান্তে চারজন কাঁধে নিয়ে গ্রামে দিকে রওনা হয়ে যায়।

এদিকে লাকরি আনতে যাওয়া বৌটি এখনো বাড়িতে ফিরে আসেনি। ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় নিজের জীবন সঙ্গীটির অপমৃত্যুর খবর এখনো সে জানেনি। নতুন জীবনের তিনটি মাস পেরোতে না পেরোতে অপুরনীয় এক ক্ষতি হয়ে গেছে। – তাও এখনো জানা হয়নি। শুধু জেনেছে-সুন্দর সুখী জীবনের জন্য সংগ্রাম করে যেতেই হবে। দু'চোখে শুধু সুখের স্বপ্ন দেখতে হবে-সে সুখ পায় কিংবা না পায়।

যখন জানবে তার জীবনের এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের কথা, অপুরণীয় ক্ষতির কথা– তখন শোকে দুঃখে হয়তো মূর্ছা যাবে কিছুক্ষণ, কাঁদতে কাঁদতে গলা ফেটে যাবে, মুখের রুচি যাবে চলে। কিন্তু সে সবতো কয়েকদিনের জন্য, হয়তো সাতদিন, নয়তো একটা মাস। তারপর কোনদিন মনে হবে– "এরপরও আমাকে জীবনে চলতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে।"

প্রকৃতি ও তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে বিষু

জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

'বিষু' দু'অক্ষরের সহজ সরল একটি শব্দ, চৈত্রের শেষ দু'টো দিন। প্রথম (শেষ দুটো দিনের) দিনটা "ফুল বিষু", শেষ দিনটা "মূল বিষু"। এদিন দুটো ঘিরে গড়ে উঠেছে তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের শক্তিশালী বলয়। বাহ্যিক সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না এ বলয়ের বিশালতা, যদি ডুব দেয়া না যায় তঞ্চঙ্গ্যাদের গভীর রহস্য লোকে। এ জাতির অতল রহস্যের তলাতে গেলে বুঝা যায় যে, 'বিষু' হলো আনন্দের প্রতীক, মিলন ক্ষেত্র এবং নতুন চেতনার উৎস।

'ফুল বিষু'র দিনে সকল স্তরের লোকেরা কেউ ফুল দেয় নদীতে, কেউবা ফুল তোলে বুদ্ধের নামে, কেউ কেউ ফুলে ফুলে ঘর-বাড়ি সাজিয়ে করে অপরূপা। ছেলে মেয়েরা পাখিদের হার মানিয়ে খুব ভোরে উঠে পাড়াময় ঘুরে বিভিন্ন বাগান থেকে সংগ্রহ করে বৈচিত্র ফুল। সংগৃহীত ফুলে এরা গাঁথে মালা, এ মালা বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে চলে দেওয়া -নেওয়া, গড়ে ওঠে সুদৃঢ় সম্প্রীতি। এ দিনে বাড়ি ঘর, আঙ্গিনা থাকে চিকচিকে পরিষ্কার। কিশোর-কিশোরীদের চলে যেন নীরব প্রতিযোগিতা কে কার বাড়ি ঘর কত বেশি ফুলে কত সুন্দর করে সাজাতে পারে। 'মূল বিষু'র দিন চলে যায় আনন্দ উল্লাসে, হাসি-খুশিতে, ঘুরে ফিরে চাক-চিক্যতার মধ্য দিয়ে।

'বিষু' শব্দটা প্রকৃতির মতই নির্মল, অকৃত্রিম। প্রকৃতির সাথে রয়েছে অপূর্ব সেতু বন্ধন। বিষু পূর্ব ধরে বেশী কয়েকদিন ধরে চলে ঘরে ঘরে বিষু আয়োজনের নানা পরিকল্পনা। এরই সাথে প্রকৃতি ও থেমে থাকে না। পৌষ মাঘের নিষ্ঠুর কন-কনে শীতল থাবার ঈর্ষা জাগে, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি। সে তার ঈর্ষান্বীত হিংস্র থাবায় কেড়ে নেয় প্রকৃতির শ্যামল মহিমা; প্রকৃতি হয়ে পড়ে রুক্ষ, নগ্ন, বিদগুটে। বিষু আগমন উপলক্ষে তঞ্চঙ্গ্যাদের ঘরে ঘরে যখন হৈ চৈ পড়ে নতুন জামা কাপড়ের বায়নায়, তখন প্রকৃতির ও বোধোদয় হয়-তঞ্চঙ্গ্যাদের নতুন জামা কাপড়ের রঙিন সজ্জার সাথে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির আবির্ভূত হয় কচি পাতার সবুজ শ্যামল সজ্জায়, রূপ নেয় পূর্ণ যৌবনার। পার্বত্যাঞ্চলের সারি-সারি ঢেউ হেলানো পাহাড়গুলো হয়ে উঠে শ্যামলে শ্যামলী, সৌন্দর্য্যের আঁধার, স্বপ্ন পুরী। প্রকৃতির মনোহরনী সৌন্দর্য্যে অস্থির হয়ে দক্ষিণা দোয়ার ভেঙে আসে সমীরণ। সমীরনের স্পর্শে প্রকৃতি হয়ে ওঠে চঞ্চল, আবেদন ময়ী। এ চঞ্চলতায় নেচে উঠে তার শ্যামল বসন, থরথর মধুর সুরে তুলে মূর্ছনা। প্রকৃতি আর সমীরণের মধ্যে চলে মিলন খেলা, এ মিলন খেলায় অবিভূত হয়ে বিষু পাইত (এক প্রজাতির বসন্তকালীন পাখি) গুলো ডেকে উঠে বিষু আস্যোক, বিষু আস্যোক (বিষু আসুক, বিষু আসুক); বিরহী কৌকিল কু-উ, কু-উ রবে ডেকে বেড়ায় অভিমানী প্রিয়ার খোঁজে। অন্যদিকে তঞ্চঙ্গ্যা কিশোর কিশোরীদের মনেও জাগে বিষু আগমনের চঞ্চলতা, তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলো প্লাবিত হতে থাকে বিষু আগমনী খুশির প্লাবনোচ্ছাসে। প্রকৃতি আর কিশোর কিশোরীদের উচ্ছাস ভরা চঞ্চলতায় বিষু পায় পূর্ণতা।

'বিষু'কে ঘিরে আবর্তিত তঞ্চঙ্গ্যাদের বিস্তৃত সংস্কৃতির অপরিমেয় পরিমন্ডল, যা অন্যান্য জাতি সত্ত্বা থেকে তঞ্চঙ্গ্যাদের স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক সত্ত্বাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অন্যান্য যেকোন জাতির উন্নত, রুচিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে কোন অংশেই কম সমৃদ্ধশালী নয়। এ উৎসবকে ঘিরে ঘরে-ঘরে তৈরি হয় সান্যা পিড়া, চুশ্যাং পিড়া, মু পিড়া/মিড়া পিড়া (বিনি চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরী ঐতিহ্যবাহী পিঠা), কলা পিড়া রান্না হয় বিনি ভাত; ঘরে ঘরে চলে রসনাবিলাস, এছাড়া ও থাকে নানা রকম ফলাদি, দেশীয় মিষ্টি, নানারকম পানীয়। মূল বিষু দিন ঘরে-ঘরে এসব সুস্বাদু খাবার খাওয়া এবং পানীয় পানের মহোৎসব। সারা গ্রামে প্রতিটি ঘরে ঘরে, ঘুরে ঘুরে আতিথ্য গ্রহণের মাধ্যমে খাওয়া চলে এসব পানীয়, খাবার। এভাবে খাওয়ার মধ্য দিয়ে ঘুচে যায় এক পরিবারের সাথে আরেক পরিবারের বিরোধ, এক জনের সাথে আরেক জনের মন-মালিন্য, শত্রুতা। এ ভুল বুঝাবুঝি, শত্রুতা দূর হয়ে গড়ে ওঠে সুদৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ অতুট সেতু বন্ধন। বিষুতে দিনের বেলায় ছেলেরা খেলে নারেং হালা (লাটিম খেলা), ডুডু হালা (হা ডুডু), গাত হালা (একটা গর্তকে কেন্দ্র করে কয়েকজন ছেলের মধ্যে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ঘূর্ণায়মান বিশেষ খেলা), রাতে বাড়ির আঙ্গিনায় মশাল জ্বালিয়ে কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী, পৌঢ়-প্রৌঢ়াদের মধ্যে চলে প্রাণোচ্ছল ঐতিহ্যবাহী ঘিলা হালা (ঘিলা হল এক জাতীয় বনস্পতি ফল, এ. ফল নিয়ে বিশেষ খেলাই ঘিলা খেলা), এ খেলা উৎসাহ ভরে গভীর রাত পর্যন্ত খেলা হয়। কোন কোন এলাকায় এক গ্রামের সাথে আরেক গ্রামের এ খেলার প্রতিযোগিতা চলে; বিজয়ীদের দেয়া হয় ট্রফি। গ্রামের কোন কোন বাড়িতে (বিশেষ করে গ্রামের হেডম্যান, কার্বারী অথবা অবস্থাপূর্ণ গৃহস্তের বাড়িতে) চলে গিংগুলি গীত। এ গীত চলে রাতভর, গিংগুলিরা বেহেলা বাজিয়ে গান গায়। গিংগুলি তার মধুর গানের সুর আর বেহেলার মূর্চ্ছনায় ভুলিয়ে দেয় গ্রামবাসীর ঘুম। এ গীতের মধ্য দিয়ে ফোটে ওঠে অনেক পুরনো

কাহিনী, বিশেষ করে রাধামন ধনপুদির কাহিনী। এ কাহিনী মূলত প্রেমের উপাখ্যান। গ্রামবাসীরা ঘুম ভুলে সারারাত বসে থাকে। গিংগুলি চারপাশে গান শুনে হৃদয় দিয়ে। যখন গীতের বিশেষ কোন কথা, সুর তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাড়া দেয়; তখন শ্রোতারা আবেগপ্লুট হয়ে ই-হো-হো, ই- হো- হো রবে উল্লাসিত আনন্দ ধ্বনি দেয়। ঘিলা খেলা এবং গিংগুলি গীত গ্রাম্য লোকদের কর্মব্যস্থতার এক ঘেঁয়েমী কাটিয়ে এনে দেয় বিনোদনের অপূর্ব স্বাদ। তবে শহরাঞ্চলে এ গীত ও খেলা হয় না বললেই চলে। শহরাঞ্চলের যুবক-যুবতী কিশোর কিশোরীরা যায় পর্যটনে। রাত্রে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় চলে জাতীয় নৃত্য, গান; বাজানো হয় বাঁশি; হেংগং, ডুডুক ইত্যাদি।

'বিষু'কে ঘিরে তঞ্চঙ্গ্যাদের রয়েছে সাহিত্য কর্মের বিশাল ভাণ্ডার। 'বিষু'কে নিয়ে অনেকে লিখেছে অনেক কবিতা, ছড়া, গান, ছোট গল্প, প্রবন্ধ আরও কত কী। বিষুকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের এ বিপুল সৃষ্টির পথ ধরে তঞ্চঙ্গ্যা সংস্কৃতমনা সচেতন সমাজ গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশ করছে বিভিন্ন প্রকাশনা।

'বিষু'র সাথে আর একটা দিন'কে তঞ্চঙ্গ্যারা পালন করে থাকে, তা হলো নববর্ষ। এ দিনকে তারা প্রার্থনার দিন হিসেবে পালন করে থাকে। এ দিনে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পরিবারের সকলে বিভিন্ন দানীয় বস্তু নিয়ে বিহারে যায়। বিকালে আরম্ভ হয় ধর্মানুষ্ঠান, সকলে পঞ্চশীলে অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্মীয় বাণী শ্রবণ করে এবং প্রার্থনা করে নতুন বছরটা যেন সুখের হয়, ক্ষেতে ভাল ফলন ফলে, বিশ্বজুড়ে শান্তি বিরাজ করে।

শেষে তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি'কে সংরক্ষণ ও লালন-পালন করে উন্নতির পথে ধাবিত করবে এই আশা ব্যক্ত করি এবং সাংস্কৃতিক বহু কর্মকাণ্ডের আঁধার বিষু হয়ে উঠুক অমর এ প্রার্থণা করি।

তন্‌চংগ্যাদের রাষ্ট্রভাষা চর্চা ও একটি প্রস্তাবনা

– কর্মধন তন্‌চংগ্যা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে যে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে-তন্‌চংগ্যা তাদের একটি। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাংগামাটি ও বান্দরবান, জেলায়।) চট্টগ্রাম জেলায় রাঙ্গুনিয়া থানাধীন, রইস্যাবিলি, সাদিক্যাবিলি এলাকায়, কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ ইত্যাদি অঞ্চলে তন্‌চংগ্যাদের বসবাস রয়েছে। অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো তন্‌চংগ্যাদের ও রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্মদের মধ্যে তন্‌চংগ্যা-রাও রাষ্ট্রভাষা খুব সহজে বুঝতে পারে এবং বলতে পারে। তার কারণ অন্যান্য জুম্মদের মতো তন্‌চংগ্যাদের ভাষার সাথে বাংলা ভাষার কিছুটা মিল রয়েছে। ফলে তন্‌চংগ্যাদের কথাবার্তায় প্রচুর বাংলা লক্ষ্য করা যায়। এবং তারা সাহিত্য চর্চায় নিজ লিপি চাইতে বাংলা লিপি বেশি ব্যবহার করেন। তাদের ভাষাটা বাংলা অপভ্রংশে রূপ বললেও তা অত্যুক্তি হবে না। যেমন–

	বাংলা	তন্‌চংগ্যা
১।	আমি যাব/ যাইব।	মুই যাইন্/যেইন,
২।	আমরা যাব/যাইব।	আমি যাবং/যেবং
৩।	আমি বাড়িতে যাই।	মুই ঘরত্ যাং/ মুই ঘঅত যাঙত
৪।	আমরা বাড়িতে যাই।	আমি ঘরত যেইর/ আমি ঘঅত যেইত।

তন্‌চংগ্যাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা কালের চর্চার অভাবে তারা বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় তারা কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনা করে আসছেন। এসব সংখ্যা কম হলেও গুনগত মানে কম উল্লেখযোগ্য নহে।

কার না, নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলতে এবং সাহিত্য চর্চা (লেখালেখি) করতে ইচ্ছে না জাগে। তারপরও তন্‌চংগ্যাদের বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা (লেখালেখি) করার এই প্রবণতা কেন তার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. প্রথমেই বলা হয়েছে যে, অন্যান্য জুম্মদের মতো তন্‌চংগ্যারাও বাংলা খুব সহজে বুঝতে পারে এবং বলতে পারে। কারণ তাদের ভাষা বাংলা সমগোত্রীয় অর্থাৎ ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভূক্ত। বিখ্যাত জার্মান ভাষা তাত্বিক ডঃ জি এ গ্রীয়ারসন তার লিখিত- LINGUISTIC SURVEY OF INDIA (Culcata -1903) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি এই অঞ্চলে সকল আদিবাসী জনগণের ভাষা, বর্ণমালা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন । ইহাতে তিনি এতদঞ্চলে তন্‌চংগ্যা ও চাকমাদের ভাষাকে Indo-aryan (ভারতীয় আর্য ভাষাভুক্ত) চিহ্নিত করেছেন।

২. শিশুকাল থেকে গৃহে ও শিক্ষালয়ে বাংলা বর্ণে এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করা।
৩. বাংলা ভাষায় পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি পাঠের সুযোগ এবং সহজলভ্যটা।
৪. নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালায় শিক্ষা লাভের সুযোগ না থাকা।
৫. নিজস্ব বর্ণমালায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতা।
৬. বাংলা পত্র-পত্রিকায় নিজেদের লেখা-প্রকাশের সুযোগ।
৭. ভৌগোলিক ও স্থানীয়ভাবে বাংলা ভাষার প্রভাব বেশী হওয়া।
৮. নিজস্ব বর্ণমালায় প্রকাশিত কোন-পত্র পত্রিকা না থাকা যেগুলিতে নিজেদের লেখা প্রকাশ করা যায় ও নিজস্ব অক্ষরের ছাপাখানা অভাব এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের সুযোগ না থাকা। এইসব কারণে তন্‌চংগ্যা লেখকগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে বাধ্য হয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। ফলে তারা সাহিত্য চর্চায় নিজস্ব ভাষার চাইতে-রাষ্ট্রভাষাকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন।

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাইখ্যং এর আশাছড়ি মুখ নিবাসী পণ্ডিত পমলাধন তন্‌চংগ্যা ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে "ধর্মধ্বজ জাতক" নামে একটি গ্রন্থ বাংলায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহা গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত কাহিনী সম্বলিত। এছাড়া তিনি কবিরাজী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় একজন সফল চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি তার প্রস্তুতকৃত ঔষধ বহুল প্রচারের জন্যে বিজ্ঞাপন বিলি করতেন এবং যেগুলো তিনি বাংলায় ছাপাতেন।

১৯৩৫-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিরত্ন কার্তিক চন্দ্র তন্‌চংগ্যা "বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা", "উদয়ন বত্থু", "গৃহী বিনয়", " বৌদ্ধ গল্প মালা", "কুল ধর্ম", 'বোধি পালঙ্ক" প্রভৃতি এবং আরও অনেক পুস্তক বাংলায় রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গৌতম বুদ্ধের অতীত জাতক কাহিনী অবলম্বনে "মানুষ দেবতা" নামে তিন অঙ্কের একটি নাটক রচনা করেন। যা রাজস্থলী বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়েছে।

শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো গৃহীর নাম ফুল নাথ তন্‌চংগ্যা। রাজগুরু নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি চাকমা ও তন্‌চংগ্যা সমাজে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রবক্তা। "শ্রামণ কর্তব্য", "সমবায় বুদ্ধোপাসনা", "পরিনাম", "অনাগত বংশ" "চাকমা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ – আগর তারা", "বৌদ্ধ ধর্মের স্বরূপ", "বিজ্ঞান ও বৌদ্ধ ধর্ম"প্রভৃতি তার অমর অবদান ও এগুলো তিনি বাংলায় প্রণয়ন এবং প্রকাশ করেন।

শ্রীমৎ ক্ষেমাংকর মহাস্থবির গৃহীনাম তেজেন্দ্র তন্‌চংগ্যা। তিনি লেখালেখির কাজ আরম্ভ করেন ১৯৮০ সাল থেকে। "বুদ্ধ প্রকাশনী" "মাতিকা ধাতু কথা স্বরুপিনী", "অভি ধমার্থ সংগ্রহ স্বরুপনী","যমক স্বরুপিনী", "চলার পথে", "পথ প্রদর্শন" তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ। এছাড়া- "বিভঙ্গ", "পাঠ্‌ঠান", "কথাবত্থু", "ধর্ম সংগিনী" – প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তার সব গ্রন্থগুলি রাষ্ট্রভাষায় রচিত।

তন্‌চংগ্যাদের মধ্যে যে ক'জন সাহিত্য চর্চা করেন তারা হলেন রতিকান্ত তন্‌চংগ্যা, যোগেশ চন্দ্র তন্‌চংগ্যা, বীর কুমার তন্‌চংগ্যা, সত্য বিকাশ তন্‌চংগ্যা, অজিত তন্‌চংগ্যা, লগ্ন তন্‌চংগ্যা, পারমিতা তন্‌চংগ্যা, বিশ্বজিৎ তন্‌চংগ্যা তাপস তন্‌চংগ্যা। তাদের মধ্যে বীর কুমার তন্‌চংগ্যা অন্যতম। তিনি স্কুল জীবন থেকে লেখা–লেখি আরম্ভ করেন। "অমিতাভ (নাটক)", "অন্নদাতা (উপন্যাস)", "রাঙাধনের কোচপানা", "বিষুর আর এক গল্প","পেঙস্ কর্ণার", "রাধামন পালা (গল্প)", "চাকমা-তন্‌চংগ্যা লোকায়িত দর্শন", "বোধিসত্ত্বের সাধনা", "জীবনের উৎস সন্ধানে" (প্রবন্ধ), "যদি ভালোবাস মোরে" (কবিতা), "তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি" তার রচিত গ্রন্থ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু দেশের ভিতরে নয় দেশের বাইরেও (কলকাতা) নিয়মিত লিখে আসছেন। কলকাতার "বোধি ভারতী" পত্রিকায় এ যাবৎ তার আটটি প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত হয়েছেন। "হীনযান ও মহাযান দৃষ্টিতে চাকমা জাতি", "বাল্য স্মৃতি", "এই সেই নগন্য জীবন", "তৃষ্ণা", "INQUEST OF PEACE (Poem)" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০০১ সালে পার্বত্য রাংগামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক সাহিত্যে সমমাননা পুরস্কার লাভ করেন।

তন্‌চংগ্যারা বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্যের পরিমন্ডল বৃদ্ধি পাচ্ছে ও নতুন নতুন মননশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন ঘটছে, সে ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে তন্‌চংগ্যারা রাষ্ট্রভাষায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি আজ রাষ্ট্রভাষায় বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে অনার্স পড়ছে। তন্‌চংগ্যারা রাষ্ট্রভাষায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি নিজ মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন এই আশাটুকু রাখছি এবং প্রস্তাব করছি।

ঋণ স্বীকার ঃ

১. তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি, যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা,
২. ক্ষেমাংকর মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, ওয়াপ্পা জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার।
৩. বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি।

"স্বাগতম" নব বৈশাখ

– বি, এন, তঞ্চঙ্গ্যা, কাঠালতলী
কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

হে নব বৈশাখ
এসেছো তুমি কর্মের প্রেরণা যুগিয়ে।
সুপ্ত ঘুমন্ত তরু-লতাকে তরতাজা সজীব করে দিতে,
তোমার আগমনে, নব জাগরনে ভরে যায় জগতে।
উৎসাহে আনন্দে মেতে উঠে ধরণীর সকলেই,
সাগর পাহাড় কিংবা মরু অঞ্চলে।

হে নব বৈশাখ–
তুমি এলেই পেয়ে যাই নব জীবন ও যৌবন।
করিতে চাই সকলেই তোমার পদতলে সমর্পণ।

তুমি এসো সুখের বাণী নিয়ে,
তুমি এসো সফলতার কর্ম নিয়ে।

হে নব বৈশাখ
তোমাকে – স্বাগতম স্বাগতম

শিক্ষার প্রতি

– সমীরন তঞ্চঙ্গ্যা
কাঁঠালতলী, বড়ইছড়ি।

হে শিক্ষা! তুমি একবার
চলে এসো মোদের জীবনে।
তুমি জাগিয়ে দাও; জাগিয়ে তোল,
ভাবিয়ে দাও; ভাবিয়ে তোল,
মোদের সুপ্ত নবীন প্রাণে।
তুমি অনন্ত দিশারি মহা প্রাণ,
কভু ভুলো না
মোরা যে নবীন প্রাণ।
সামনে মোদের আসৃছে কঠিন আগামী,
মোদের নবীন প্রাণে
তুমি শক্তি, তুমি আলোক
তুমিই মোদের অন্তযামী।
তুমি ভেঙে দাও
মোদের আদি; ধুম্র লোকাচার,
গড়ে দাও
নতুন ঠিকানা, নতুন জীবনাচার।
দিগ্‌ভ্রান্ত অতি ক্ষুদ্র
জাতির নবীন মোরা
সদা পাই যেন তোমারই সাড়া,
নবীনের কানে কানে
নতুনের সুরে -সুরে
তুমি শোনাও নতুন গান,
বিভ্রান্ত জনপদে নবীনের তরে
ঘোষণা কর তোমারই ঐক্যতান।
মোদের প্রতি নবীনের প্রাণে
তুমি গজাও তোমারই বীজদন্ত
তুমি যে সারা বিশ্বের
সকল জাতির মেরুদন্ড।

বিষু মানে

–উজ্জ্বল তন্‌চংগ্যা
রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি।

বিষুমানে মুক্ত পাখির ন্যায়
স্বপনীল আকাশে ঘুরে বেড়ানোর উল্লাস।
বিষুমানে, নব আনন্দের ছোঁয়ায়
উত্তাল তরঙ্গে ভেসে উঠা তারুণ্যের সুর।
বিষুমানে, পূর্ণিমা জ্যোৎস্নার আলোতে
মৃদু হাওয়ায় সুগন্ধি ফুলের সুবাস,
বিষুমানে, সীমাহীন আবেগ নিয়ে
তরুণ-তরুনীর হৃদয়ে আনন্দের আত্মচিৎকার,
বিষুমানে, গেংখুলীর উদভাসিত কণ্ঠে
জেগে উঠা সোনালি দিনের রূপকথা,
বিষুমানে, অতীতের দুঃস্মৃতি মুছে
উল্লাসিত মনে সামনে অগ্রযাত্রার প্রতিজ্ঞা
বিষুমানে, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে
ঐক্যের মোহনায় একতাল হওয়ার প্রয়াস,
বিষুমানে, পুরনো বিদায়ের বার্তায়
সূচিত হওয়ার আরেক নতুন অধ্যায়।

আবারও বিষু

–স্বপ্না তঞ্চঙ্গ্যা
রেইছা, বান্দরবান।

বিষু তুমি আবারো এসেছো,
ষড়ঋতু পার করে রঙিন ধরায়।
প্রতিদিনের পূর্বদিগন্তে রক্তিম উদীয়মান সূর্যের-,
আর পশ্চিমাকাশের গোধূলি আলোর ন্যায়।
বিদায় জানিয়ে বসন্তকে গ্রীষ্মের নবসুচনায়
হৃদয়ের গভীরে উৎসবের পরিপূর্ণতায়।
বিষু তুমি আবারো এসেছো,
প্রকৃতিকে রূপে অপরূপ করতে-
আপন সাজের মহিমায়।
তুমি আবারো এসেছো,
প্রকৃতিকে রূপে অপরূপ করতে-
আপন সাজের মহিমায়।
তুমি আবারো এসেছো,
হাজার লোকের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত কাটিয়ে
ভোরের শিশির সিক্ত ঘাসের আঙিনায়।
তুমি আবারো এসেছো,
অন্ধকারাচ্ছন্ন অগ্রপথিককে
আলোর পথে ধাবিত করতে
এক অসীম আকাশের সীমানায়।

অনেক দিনে সর

স্মৃতি

– পাভেল তনচংগ্যা
বারঘোনীয়া,কাপ্তাই।

ফেলে আসা পুরানো সে দিন
ভুলে যাওয়া অতীত স্মৃতি
মনে জাগে আজ বার বার।
সে কথা স্মরণে এলে হায়
আঁখি কেন ঝরে যে আমার।
ডেকেছিলে বিষু বলে তুমি,
ভালোবাসি দিবসে রজনী
পূজোর দেবতা শোনো তবে
আজ কেন মন এতো ভার।

স্মৃতি আজ হয়েছে স্বপ্ন
অশ্রুর সাগরে ভেসে চলি
ফুটে না কুসুম আর বনে
বাজে না নূপুর দুটি পায়
অশ্রুর লিপিকা লিখি আজ
চোখের পাতায় অনিবার।

বিষু

–চরণ বিকাশ তনচংগ্যা
বারঘোনীয়া, কাপ্তাই।

হে বিষু,
তুমি আসবে বলে
কতনা প্রহর গুণে
অপেক্ষায় ছিলাম আমি।

হে বিষু,
তুমি এসেছো
প্রকৃতির নিয়মে
শুভ বাংলা নববর্ষের
আনন্দের বার্তা নিয়ে।

হে বিষু,
এই দিনে এই ক্ষণে
ধনী, গরীব নির্বিশেষে
সকলে মিলে মিশে
কত না আনন্দ উল্লাসে
মেতে উঠি মাতৃভাষার গান
গেয়ে।

হে বিষু,
আজ তোমাকে বরণ করে
হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
শুভ নববর্ষে শপথ নিয়ে
নব দিগন্তের সূচনা করি।

বিন্যা পোয়াইত্স্যা

–লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি।

ইককিনা য্যেন্ বিন্যা পোয়াইত্স্যা,
আহং বই মুই
অ-চ-ল এক মুড়ার
জুম ঘরর্ ইচর মাদাত্
গাই গাই গুরি।
উই বেল ছলক উদের ফুদি
রাঙাগুরি পুয়েদি।
সংসারান য্যেন্ ঘুম যায় আহে
ন-মাদি চুপ গুরি।
বেলান্ যক্কেনে উদিব
মাদি ফাদি
সংসারান জায়িব
হ্আচি হ্আচি নাচি নাচি।
কদ রঙে ফুল য্যেন্
মাধা লারিবাক
কদ সুরে নানা পাইস্যে
গুণ গুনাবাক;
মুইঅ ছক্কে মনসুয়ে
উদিন নাচি
মন হ্ধা ফুদাই কইন
উবাগীত ধুরি।

নআ বছ ই দিন নআত

– অজয় তঞ্চঙ্গ্যা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ওই ছেড়ক কি ঘুম যত্তে
বেল ল-আ রে উতছ্যে ছিরে,
বিছানত্তুন উরিনান দয়াত্তান খুলি চারে
চায় খাত্যু কি ঝক ঝক্যা পহ্।

উঠনা ঘুমত্তুন
ইয়ান কি খব ন-পাইত
আতছ্যারে ন-আ বছ।
উঠ উঠ যারি ঘুমত্তুন
ছারে বা আমা ঘয়ান চায় খাত্ত্যুন
যি মানুতয্যুন আগন
কি লাভা গুই তা কামানি গত্তন।

আ-কি ছেড়ক ঘুম যত্তে
নাকি কাল্যা তয়ে রাগগুইনান
করা এক্কান কুয়ং বিলি স্যানে-
মে অভিমান গুইনান ইছ বিছানত পুই আগয়ত।

ছিক্কুই নান জাগি জাগি পুই তেলে
ঘুম ন-এনান ঘুম গেলে
রোগে রে পেবরে স্যা
উঠ না যারি ঘুমত্তুন
পুই নত্তেত ম-পআনান রই।

যে আচ্ছ্যা ই নআ বছ বিশেষ দিন-ন-আত
অতীত'র রাগ-ভুল ব্যাগ পুই পেলেনান ব্যাক্কুনে
মিলি সবক খেগই
ক্যোয় কা উবে রাগ নথুই নান
আমা পরিবার ট-আ যাতে উন্নতি খাত্যু-নি পায়
বুদ্ধত্তুন সি আর্শীদবাত্তান মাগি গই।

জীবন'র চলিবার পথ তানত ভুল উব স্বাভাবিক
ভুল মানষ্যরই অয়
স্যানে তুই মে রাগগুইনান পুই খেবে
সেয়ানদ নয়।

বর মাঅং

– চন্দ্রসেন তন্‌চংগ্যা
ওয়াগ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, কাপ্তাই।

পাত্তুরু তুরু পহ্‌র জাঙাল
জীবনান দোল ওক্ তর।
তরে নিচাইনে ই দুনিয়ান
ওক আর আর পহ্‌র।

প্রণাম জানাং তারা টেঙত
ত জন্ম দিয়া মা-বাবরে,
প্রণাম জানাং তারা জ্ঞান-রে
প্রণাম তারা গম বুদ্ধিরে।

তুই শুনাবে আমা কথা
ই পিত্তিবি মানুষ্যুন-রে
যি কথানি শুনিনে তারায়
চিনিবাক আমা জাদ-রে।
ঝারপদ কায়া জ্ঞান পত্তান দেয়াইত,
জ্ঞান পদে পদে সুঅ পদত্ নিচাইত।

আমি উলং ঝার মানোইত
আমানে তুই ফিরি চাইত,
আমি যাত্তে কাদাই পারি
মুরামুরি আনদার রাইত্।

চন্দ্রসেন তন্‌চংগ্যা
গ্রাম: উত্তর দেবতাছড়ি
ডাক: বড়ইছড়ি
উপজেলা: কাপ্তাই
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

জাগি উড়ি

–ইন্দ্র বংশ শ্রমণ (কৃষ্ণ প্রেসমা তন্‌চংগ্যা)
রেইছা, বান্দরবান।

আইছ বাপ-ভাই মা-বোইন লক
কনে কন্‌না কুরু আগি
ব্যাক্কুনে মিলি আমা জাত্তআ
ইক্কুনু জাগি তুলি।
লেগা-পড়া, ধর্ম কর্ম, জ্ঞান বিজ্ঞান শিগি
জনমত মানৈত্ ওই
ব্যাককুনে মিলি আমা জাত্তআ
ইক্কুনু জাগি তুলি।
জাগা পানি নাশা ওইল
গম শিক্ষিত নাই আমাত্তুন
ব্যাক জিনিট পত্র ও মংগা ওইল।
আমি দি চুগে দিগি, শুনি গৈল্লেরো জানি
তো ক্যা ঘুমত আগি
ব্যাক্কুনে মিলি আমা জাত্তআ
ইক্কুনু জাগি তুলি।
বুগত্ সাঅইত লৈ সবক্ কাই
আমি মাইনচেও দোক্‌ক্যা
জনমত্ মানৈত্ অবং
ই গম জাঙালান ব্যাক্কুনে মিলি দেগায়বং।
ছিলক্কে আমাত্তুন পৈবোছি সুগ দিন
ছি দিনোই আমা ব্যাক আশা পুন্ন অবো,
আ ঘুমত নয়
পুব কাইত্‌ছ্যা রাঙা বেলান উড়েতছি
আমা কবাল ফুরেত্‌ছি।

খুশির দিন

–তাপস তন্‌চংগ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (এম, এ ফাইনাল)

বছর শেষে আসে আবার
একটা খুশির দিন
মনের আনন্দে কাটাই সবাই
একটা বিষুর দিন।
নানা খানা-পিনার আয়োজন
চলে ঘরে ঘরে।
বন্ধু -বান্ধব মিলে সবাই
ঘুরে ঘরে ঘরে।
দুঃখ গ্লানী, ভেদাভেদ ভুলে
করে সবাই আলিঙ্গন
হাসি-খুশি আনন্দে সবার
উঠে-ভরে মন।
ঘিলা খেলা, নাদেং খেলা
খেলা কত কিছু
ছোট বড় মিলে সবাই
দিনটা হলো বিষু।

তঞ্চঙ্গ্যা গান

মিলন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (কবিরাজ)
বালাঘাটা, বান্দরবান।

ও গাবুরী সাজিপাড়ি কুরি যত্তে তুই
ত-লগনে মে নিবেনে মুই-অ বেরুংগোই॥
আত্তে-আত্তে ঢাগে-ফাগে পিচ্ছোয়া রিনিসর
মন-মত্তন মানুইত্ পেলে নিবে মনে অর।
গায়-গায় তুই কুরি যেবে সাঙাইত দিরুং গোই॥
পুগ মুইনত্ ফুবং পাইত ছোয়া বিষু ডাগেত্তে
শেমে গাচ্ছ্য রাঙা ফুললুন লাভা দেগাত্তে।
মনে কত্তে তুই মুই যেনান জোড়া কুকিল ওই॥
মনে মনে ভাবিচত নিবেনে ন-নিবে
পিচ্ছোয়া ফিরি ইশারাদি হয়ত ডাগিবে।
জু-অ, জু-অ ব বাসেত গাঙ কুয়ে কুয়ে
ভমরায় মধুখারন নানান ফুলে ফুলে
বালুচত আরিবং কড়া কুবং বোয়॥

গান

–জ্ঞানময় তন্‌চংগ্যা
খাগড়া, রাঙ্গামাটি।

আইস্‌ ভাই বোনলগ আমা লগে
লেখাপড়া শিগিই গোই
পুরান দিন-মাদান ফেলাই
শিক্ষিত উবার চে-গে-ই (॥)
ছড়াই ছড়াই জুমে জুমে
বেড়াই থালে ন-উব
সং সমাজ্যা মিলিনে
স্কুল্‌ত গেলে গম উব (॥)
আইস্‌ আইস্‌ বেয়াককুনে বই-খাদা আদত্‌ লোই (॥)
যেককনে আমি শিক্ষিত উবং
ক-ন দুঃখ ন-থাব
এ পিথিবীর দিন মাদান লই–
আমা মনান মিলিব
সেক্‌কনে তাল মিলাবং উন্নত্‌ দেশ মাইনছ লই।
আইস্‌ আইস্‌ ভাই-বোনলগ বেয়াক্কুনে
বই-খাদা আদত্‌ লোই (॥)

চুট্‌কী (কথার কথা!)

– লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি।

১। কেবলার স্ত্রী বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ির পার্শ্বে বেশ কিছুক্ষণ কাজ করছিলেন। এক সময় স্বামীকে ডেকে "ছাড়িবা দে-রেই" বলে ছাতা খুঁজলেন। স্বামী কেবলা খুব দেখে -শুনে একটি চলনসই শাড়ি নিয়ে স্ত্রীকে দিতে যাচ্ছিলেন–স্ত্রী বললেন, "না, না!" কেবলা বলে, "এটা শাড়ি নয় কি?"- পরে স্ত্রী মাথার উপর হাত দিয়ে ছাতা ধরার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, "শাড়ি নয়–ছাড়ি/ছাতা।" – এতক্ষণে বুঝাবুঝি হলে দু'জনে বেশ করে হাসলেন- হা-হা-হা-হা।

২। টেকনাফ থেকে রাংগামাটির বনভান্তের কেয়াঙে আসা মাঝ বয়সী এক তঞ্চঙ্গ্যা -মহিলার নাম জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, "উমাচিং চাঙমা।" ফের জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনার পরনে তঞ্চঙ্গ্যা পোষাক, কথাও বলছেন তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়, আবার নামে মারমা, পরিচয়ে চাঙমা;– ব্যাপারটা?" –উত্তর আসলো, "না, না– মুই চাঙমা।"

৩। মইনডং পাড়ার লোকজন মদ-জুয়া, অনাচার ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন ছিল। এক ধর্ম সভায় ভান্তে মন্তব্য করলেন, "পাড়াটি জংগলে পরিপুর্ণ হয়ে গেছে। ধর্ম জলে পরিষ্কার করতে হবে।" – একথা শোনে পরদিন পাড়ার এক লোক কোদাল নিয়ে নিজ বাড়ির চারিপাশ পরিষ্কার করতে লাগল। আর আশেপাশে সবাইকে তা করতে তাগাদা দিচ্ছিল। –"আহা- সমঝবুঝি!

১৪১০ বাংলা নব বর্ষ (বিষু উৎসব) উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তনচংগ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে 'পহ্‌র জাঙাল' (আলোকিত পথ) নামে একটি সংকলন প্রথম প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমরা সকলে আনন্দিত। এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

(অজিত কুমার তনচংগ্যা)
সাধারণ সম্পাদক
তনচংগ্যা চাকুরীজীবি কল্যাণ সমিতি
বড়ইছড়ি, কাপ্তাই, রাংগামাটি।

(কালীময় তনচংগ্যা)
সভাপতি
তনচংগ্যা চাকুরীজীবি কল্যাণ সমিতি
বড়ইছড়ি, কাপ্তাই, রাংগামাটি।

গাছ লাগান-পরিবেশ বাঁচান
গাছ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করে।

১৪১০ বাংলা নব বর্ষ (বিষু উৎসব) উপলক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে বিষু উপলক্ষ্যে তঞ্চঙ্গ্যাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা "পহ্‌র জাঙাল" ১ম সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি এবং এই ধারা অব্যাহত থাকুক এ কামনা করছি।

নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
সভাপতি
উপজাতীয় কাঠ ব্যবসায়ী ও জোত মালিক কল্যাণ সমিতি
কাউখালী থানা শাখা
ঘাগড়া, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে 'বিষু' উপলক্ষে প্রকাশিত তঞ্চঙ্গ্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা 'পহ্‌র জাঙাল' এর প্রকাশ সার্থক হোক এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত ও অন্যান্য সকল তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীকে 'বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা' এর পক্ষ হতে জানাই আন্তরিক মৈত্রীময় শুভ বিষু ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যান সংস্থা

সভাপতি
প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যান সংস্থা

তনচংগাদের ব্যবহার্য ঐতিহ্যবাহী অলংকার রাখার ঝুড়ি এবং অলংকার
Gazi Mamun
GAZI COMPUTER